মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রদ্রোহী

মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রদ্রোহী

আসাদ বিন হাফিজ

মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রদ্রোহী

মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রদ্রোহী

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন.ঢাকা

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রদ্রোহী ◆ আসাদ বিন হাফিজ। প্রকাশক ◆ প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড়মগবাজার ঢাকা-১২১৭। ফোন: ৮৩২১৭৫৮ মোবাইল: ০১৭১১৫২৫৩৩৬। প্রথম প্রকাশ ◆ জানুয়ারী ২০০৮। প্রচ্ছদ ◆ প্রীতি ডিজাইন সেন্টার। মুদ্রণ ◆ প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস।

নির্ধারিত মূল্য ◆ পেপাব্যাক ৪০ টাকা বোর্ড বাঁধাই ৭০ টাকা।

Moktijuddho Juddaporadhi Rastrodrohi. by : Asad Bin Hafiz. Published by Preeti Prokashon. 435/ka Bara Moghbazar- Dhaka-1217. Phone: 8321758. Published by: January 2008.

Fixt Price: News Tk. 40.00 White 70.00 only.
ISBN-984-581-268-6.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান হবে কবে? ০৯
২. যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত বিতর্ক ও কয়েকটি বিবেচনা ২৪
৩. স্বাধীনতা বিরোধী ও ধর্মীয় রাজনীতি প্রসঙ্গ ৩৯
৪. একাত্তরের রাজনীতি ৪৩
৫. জনাব রাশেদ খান মেননের রাজনৈতিক দর্শন ও ধর্মচিন্তা ৫২
৬. রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন : যেভাবে যাত্রা হলো শুরু ৬৩
৭. মুক্তিযুদ্ধ কি রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটিয়েছে? ৭৫
৮. যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম ও সমাজতন্ত্র ৮১
৯. জহির রায়হানের খুনি কে বা কারা? ৮৮
১০. প্রথম আলোর ক্ষমা প্রার্থনা ও কিছু কথা ৯৪
১১. ড. আহমদ শরীফ ও প্রথম আলো গ্রুপের মিশন ১০১

১২. পরিশিষ্ট
ক. নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলীল ১০৮
খ. ভারত-বাংলাদেশ ৭ দফা গোপন অধীনতা চুক্তি ১১০
গ. ভারত–বাংলাদেশ ২৫ বছর মেয়াদী অধীনতা চুক্তি ১১১

www.pathagar.com

লেখকের গ্রন্থরাজি

প্রবন্ধ

আল কোরআনের বিষয় অভিধান ◆ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ◆ ইসলামী সংস্কৃতি ◆ ছোটদের ইসলামী পাঠাগার কেন গড়বেন কিভাবে গড়বেন

কবিতা - অনুবাদ কবিতা - ছড়া ও গান

কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর ◆ অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার ◆ নাতিয়াতুন্নবী ◆ রাজনীতি ধুমধাম ◆ হীরালালের ছড়া ◆ জ্যোতির পরাগ

সাহিত্যালোচনা ও জীবনী

ছন্দের আসর ◆ আপোষহীন এক সংগ্রামী নেতা ◆ নাম তাঁর ফররুখ

গল্প ও উপন্যাস

পনরই আগষ্টের গল্প ◆ মহাকালের মহানায়ক

শিশু সাহিত্য

আলোর হাসি ফুলের গান ◆ মজার ছড়া ◆ নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ◆ কুক কুরু কু ◆ ইয়াগো মিয়াগো ◆ হরফ নিয়ে ছড়া ◆ আল্লাহ মহান ◆ কারবালা কাহিনী ◆ মজার ছড়া আরবী পড়া ◆ মজার ছড়া বাংলা পড়া ◆ ভাষার লড়াই ◆ আলোর পথে এসো

ক্রুসেড সিরিজ

গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ◆ সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ◆ সুবাক দুর্গে আক্রমন ◆ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ◆ ভয়াল রজনী ◆ আবারো সংঘাত ◆ দুর্গ পতন ◆ ফেরাউনের গুপ্তধন ◆ উপকূলে সংঘর্ষ ◆ সর্প কেল্লার খুনী ◆ চারদিকে চক্রান্ত ◆ গোপন বিদ্রোহী ◆ পাপের ফল ◆ তুমুল লড়াই ◆ উমরু দরবেশ ◆ টার্গেট ফিলিস্তিন ◆ গাদ্দার ◆ বিষাক্ত ছোবল ◆ খুনী চক্রের আস্তানায় ◆ পাল্টা ধাওয়া ◆ ধাপ্পাবাজ ◆ হেমসের যোদ্ধা ◆ ইহুদী কন্যা ◆ সামনে বৈরুত ◆ দুর্গম পাহাড় ◆ ভন্ডপীর ◆ ছোট বেগম ◆ রক্তস্রোত ◆ রিচার্ডের নৌবহর ◆ মহাসমর

সম্পাদনা

নির্বাচিত হামদ ◆ নির্বাচিত নাতে রাসূল ◆ রাসূলের শানে কবিতা/ (যৌথ) ◆ নির্বাচিত ইসলামী গান ◆ নির্বাচিত ইসলামী গান (১-৫ খন্ড) ◆ রাজপথের ছড়া (যৌথ সম্পাদনা) ◆ বাংলা পড়া [৪র্থ ভাগ] ◆ বাংলা পড়া [৫ম ভাগ] ◆ সীমান্ত ঈগল/ নসীম হিজাযী ◆ হেজাযের কাফেলা/ নসীম হিজাযী ◆ আঁধার রাতের মুসাফির/নসীম হিজাযী ◆ শেষ বিকালের কান্না / নসীম হিজাযী ◆ কায়সার ও কিসরা/ নসীম হিজাযী ◆ ইরান তুরান কাবার পথে/ নসীম হিজাযী ◆ আলোর কুসুম/ নসীম হিজাযী ◆ দি সোর্ড অব টিপু সুলতান/ভগওয়ান এস গিদওয়ানি ◆ শিশুকিশোর কবিতা/তালিম হোসেন ◆ যাদেরাহ/ আল্লামা জলীল আহসান নদভী ◆ গল্পসমগ্র/রাজিয়া মজিদ ◆ রেওয়ায়েতু আয়েশা রা./খোন্দকার আয়েশা খাতুন

www.pathagar.com

ভূমিকা

জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এই জনগণ যদি ঘুমিয়ে থাকে তখন ভীনদেশী তস্কর এসে হানা দেয় সমৃদ্ধ লোকালয়ে। কোটি মানুষের ভাগ্য বগলদাবা করার জন্য তারা কিনে নেয় মুষ্টিমেয় বরকন্দাজ। জনগণ ঘুমিয়ে থাকে– আর এই মুষ্টিমেয় কুচক্রীরা গ্রাস করে নেয় ক্ষমতার মসনদ। তারপর শুরু হয় লুণ্ঠনের রাজত্ব। কুচক্রীদের মাথায় হাত বুলিয়ে বিদেশী দস্যুরা লুট করে নিয়ে যায় দেশের সব সহায়-সম্পদ। তারপর যখন এই লুণ্ঠনের ফলে দেশ জুড়ে নেমে আসে চরম দুর্ভিক্ষ– তখন টনক নড়ে ঘুমন্ত জনতার। চোখ মেলে তারা দেখতে পায় বিবর্ণ মানবতা। দেখতে পায় অসহায় মানুষের করুণ কান্নায় ভারী হয়ে আছে সময়ের বাতাস। তাদের চোখের সামনে দু'মুঠো অন্নের জন্য ভয়াল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে স্বজন-পরিজন। লক্ষ বনি আদমের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আর্ত আহাজারি আর বুকফাটা ক্রন্দন। পথে-ঘাটে মৃত্যুর নিষ্ঠুর বিভীষিকা।

একাধিকবার এমন দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল বাংলার মানুষের। তারা দেখেছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; কৃষি প্রধান বাংলার লক্ষ লক্ষ প্রাণ যে দুর্ভিক্ষে লুটিয়ে পড়েছিল এ দেশের সবুজ প্রান্তরে। সে দুর্ভিক্ষ কেড়ে নিয়েছিল দেশের মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ। এই দুর্ভিক্ষ এসেছিল ইংরেজদের চক্রান্তে ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌলাকে দুর্নীতিপরায়ণ আখ্যা দিয়ে মীরজাফর ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশীদের জন্য লুণ্ঠনের যে দরজা খুলে দিয়েছিল তার জের হিসাবে। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষও একই সূত্রে গাথা। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ভারতকে যে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ দিয়েছিল তার নির্মম পরিণতি বাংলার মানুষকে ভোগ করতে হয়েছে চুয়াত্তরে। পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে যে পরিমাণ মানুষ মারা গিয়েছিল তার কয়েক গুণ বেশি মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে।

আজ আবার ইতিহাসের চরম এক ক্রান্তিকালে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর লোলুপ দৃষ্টি চাটতে শুরু করেছে বাংলার মাটি। তথাকথিত সুশীল সমাজ হাত বাড়িয়ে আছে তাদের বরকন্দাজ হওয়ার জন্য। মিডিয়াগুলো তাদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। এ সময় নির্বিকার থাকার মানে

www.pathagar.com

হচ্ছে, আরো একটি দুর্ভিক্ষকে আমন্ত্রণ জানানো। কথিত দুর্নীতিপরায়ণ সিরাজদৌলাকে উৎখাত করতে গিয়ে বিদেশীদের ডেকে এনে মিরজাফর কেবল সিরাজদৌলাকেই উৎখাত করেনি, সেই সাথে ডেকে এনেছিল দুর্ভিক্ষ এবং দুশো বছরের গোলামী। শোষক পাকিস্তানিদের পরাস্ত করতে গিয়ে ভারত-রাশিয়াকে ডেকে এনে আওয়ামী লীগ কেবল পাকিস্তানিদেরই পরাস্ত করেনি, সেই সাথে ডেকে এনেছিল চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। আজ আবার জাতীয় নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে তাদের শায়েস্তা করার নামে বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানানোর নতুন কোন খেলা শুরু হয়েছে কিনা জাতিকে তা গভীরভাবে ভাবতে হবে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র দেশ থেকে নির্বাসিত, রাজনীতি গৃহবন্দী, দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ছুটছে বন্য আক্রোশে। বাজারে দোযখের আগুন। চাল, ডাল, তেল, নুনের দাম ক্রমেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

প্রকৃতি কারো ওপর অবিচার করে না এবং না জানিয়ে কারো ওপর প্রতিশোধও গ্রহণ করে না। তবে প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় নির্মম। যার যা পাওনা ইতিহাস তা কড়ায় গন্ডায় আদায় করে। জাতিকে সজাগ করার জন্য প্রকৃতির ঘন্টা বাজে প্রকৃতির নিয়মে। সে ঘন্টাধ্বনিতে যদি জাতি জেগে না ওঠে সে জাতির বিপর্যয় কেউ রোধ করতে পারে না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আগে বড় বন্যা ও তুফান জাতিকে ডেকে বলেছিল, ওঠো, জাগো, সাবধান হও। জাতি জাগেনি। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের আগে ঊনসত্তরের ঘূর্ণিঝড় জাতিকে ডেকে বলেছিল, ওঠো, জাগো, সাবধান হও। জাতি জাগেনি। এবারও সিডর এসেছে। দুর্ভিক্ষের সাবধানী ঘন্টা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে রাজধানীর ওপর দিয়ে দেশের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। আমাদের জেগে উঠার এখনি সময়। ঘৃণা আর হিংসা নয়, ভালবাসা নিয়ে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর সময়। মমতার বন্ধনে একে অন্যকে বাঁধবার সময়। যদি আমরা জেগে উঠতে ব্যর্থ হই, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে বিভক্তির গান গাই– দুর্যোগ এসে কড়া নাড়বে দরজার।

জাতির ভাগ্য নিয়ে যারা খেলা করে ইতিহাস কখনো তাদের ক্ষমা করে না। পলাশীর বিপর্যয় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যারাই জাতির ভাগ্যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে ইতিহাসের নির্মম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে তাদের সবারই। তারপরও ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত থেমে থাকে না। জাতিকে বিভক্ত করার মিশন নিয়ে আজ যারা মাঠ গরম করছেন তাদের উদ্দেশ্য বড় ভয়ংকর। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। এখনি তাদের প্রতিহত না করলে তাদের পাপ কেবল তাদেরই গ্রাস করবে না; তাদের এ অপরাধের সুযোগ দানের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কঠিন মূল্য দিতে হবে সমগ্র জাতিকে।

www.pathagar.com

এ ভুখণ্ডে যতবার দুর্ভিক্ষ এসেছে ততবারই তার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বিদেশের আগ্রাসন ও শোষণ, লুণ্ঠন। এ অবস্থায় নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করার কোন মানে হয় না। তাই প্রাণের একান্ত তাগিদে এ বইতে জাতিকে সচেতন করার জন্য কিছু তথ্য ও বিশ্লেষণ দিতে বাধ্য হয়েছি। এর সাথে একমত বা দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে সবারই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রজ্ঞাকে সরিয়ে যে জাতি শুধুই আবেগের জোয়ারে ভাসে, দুর্ভোগ কখনো তাদের পিছু ছাড়ে না। গুটিকয় ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্তের ব্যাপারে নির্বিকার ও চোখ বন্ধ করে থাকলেই নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। বিপদ মোল্লা-পুরোহিত চেনে না। সে যখন আসে সবার ওপর দিয়েই বয়ে যায়।

৩৬ বছর পর যুদ্ধাপরাধের বিচারের ধূয়া তুলে জাতিকে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে যারা আমাদের গ্যাস, কয়লা, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আমাদের সমুদ্র বন্দরগুলো বিদেশের হাতে তুলে দেয়ার পরিবেশ তৈরী করতে চাচ্ছে তাদের দুরভিসন্ধি জাতির সামনে আজ স্পষ্ট করে তুলে ধরা দরকার। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। আজকের বাংলাদেশে কারা স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি সেটাও নির্ণয় করতে হবে বর্তমান সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে।

তবে আনন্দের বিষয় এটুকুই যে, ২০০ বছর আগে সাধারণ মানুষ রাজনীতির ব্যাপার স্যাপার তেমন বুঝতো না; কিন্তু আজকে দেশের সব মানুষই কম-বেশী রাজনীতি সচেতন। নিজের ভাল-মন্দ তারা বুঝতে শিখেছে। চক্রান্তকারীদের চোখ দিয়ে নয়, তারা এখন নিজের চোখেই দেখতে পায় অনেক কিছু। আরো আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ এখনো সব অমানুষ হয়ে যায়নি। সিডরের তাণ্ডব শেষ হতে না হতেই মানুষ যেভাবে আর্তমানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে-তাতে মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। সিডর পরবর্তী ত্রাণকর্মে জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ ভুলে মমতার যে সেতুবন্ধন আমরা তৈরী করেছি, এ বন্ধন অটুট থাকলে সব সংকটে-দুর্বিপাকে আমরাই বিজয়ী হবো ইনশাল্লাহ। সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আজ প্রয়োজন আবেগ ও বিবেকের ঐক্যবদ্ধ প্রত্যয় ও প্রয়াস। আসুন, যার যেটুকু শক্তি সামর্থ আছে তাই নিয়ে এ প্রয়াসে শামিল হওয়ার জন্য ছুটে যাই প্রেম ও পবিত্রতার নিশান উড়িয়ে। নিরব দর্শক না থেকে সমূহ বিপর্যয় থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য আপন অস্তিত্বের তাগিদেই সরব ও সোচ্চার হই সত্যের স্বপক্ষে।

আসাদ বিন হাফিজ
১ জানুয়ারি ২০০৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান হবে কবে?

মুক্তিযুদ্ধের শহীদরা আমাদের সাহস ও প্রেরণার উৎস

যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ তাদের ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়। এ জাতি চিরদিন তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন তাদের স্মৃতি থাকবে অম্লান, অক্ষয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাক বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে গণহত্যা শুরু করেছিল সেই হত্যালীলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সমগ্র জাতি। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ও ঘোষণা ছাড়াই রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ এবং পিলখানার তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সৈন্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ডাক দিলে সর্বস্তরের জনতা শরীক হয়েছিল সেই যুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সোনালী সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল বাংলার মানুষ।

এ লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছিল অগণিত মুক্তিসেনা। প্রাণ দিয়েছিল অসংখ্য শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ। প্রাণ দিয়েছিল অবলা নারী আমাদের মা ও বোনেরা। আহত এবং পঙ্গু হয়েছিল বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অসংখ্য মানুষ। এইসব পঙ্গু ও শহীদের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা পেলাম একটি নতুন দেশ ও নতুন পতাকা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সিক্ত থাকবেন এইসব শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধারা।

মুক্তিযুদ্ধের এই শহীদরা আমাদের সাহস ও প্রেরণার উৎস। চিরকাল এসব শহীদরা আমাদের জোগাবে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি। যুগ যুগ ধরে আমাদের স্বপ্নে, চিন্তায় ও চেতনায় বেঁচে থাকবেন তারা। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবে– কিন্তু তারা থাকবেন আমাদের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন তাদের স্মৃতি থাকবে আমাদের নিত্যসঙ্গী। এই স্মৃতিকে বুকে ধারণ করেই এগিয়ে যাবো আমরা; এগিয়ে যাবে আমাদের পরবর্তী বংশধর এবং এরপর তাদের বংশধরেরা। এমন আকাঙ্খা পোষণ করা কোন অন্যায় নয় বরং এমনটি হওয়াই উচিত ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি হিসাবে যারা ক্ষমতায় এলেন রক্তের দাগ শুকোবার আগেই এসব আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের কথা ভুলে গেলেন তারা। বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় হলেও এটাই সত্যি, বাংলাদেশে বিগত ৩৬ বছর ধরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বেনিফিসিয়ারি। শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসে তারা ভুলে গেলেন শহীদদের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা। তারা ভুলে গেলেন, পাকিস্তানী শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্যই ছিল আমাদের সব চেষ্টা, সব সংগ্রাম। স্বাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে বিজয়ের জন্য যত রক্ত দিতে হয়েছে তার মূলে ছিল এই শোষণ মুক্তির চেতনা।

কি ছিল স্বাধীনতার চেতনা

ক্রমাগত ২৪ বছর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা একটি জাতি শোষিত হলে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ তো দানা বাঁধবেই। সেই ক্ষোভ নিয়েই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সমগ্র জাতি। শোষণ মুক্তির এই অভিন্ন চেতনাই ছিল স্বাধীনতার চেতনা। সমগ্র জাতি এই অভিন্ন চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল বলেই মাত্র নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা দেশটিকে স্বাধীন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু স্বাধীন দেশের যারা শাসক হলেন তারা ভুলে গেলেন এ চেতনার কথা। শোষণ মুক্তির চেতনার বদলে বামপন্থীদের খপ্পড়ে পড়ে তারা আমাদের শোনালেন চেতনার নতুন বাণী। এভাবে স্বাধীনতার মূল চেতনাকে পদদলিত করে তারা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চেতনার সূত্র ধরে তারা এখন ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তুলছেন। অথচ সবাই জানেন, মুক্তিযুদ্ধ ধর্ম থেকে মুক্তির কোন যুদ্ধ ছিল না, সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধও ছিল না।

আওয়ামী লীগের যে ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল সেই ৬ দফা ও ১১ দফায় সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন উল্লেখ ছিল না, স্বাধীনতার ঘোষণায় সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন উল্লেখ ছিল না, ১৭ এপ্রিল প্রথম যে প্রবাসী সরকার গঠন করা হয় সেই মুজিবনগর সরকারের ঘোষণাপত্রে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন উল্লেখ ছিল না, অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশের ধর্মভীরু মুসলমানদের ওপর তাদের ঈমান-আকিদা বিরোধী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে চালিয়ে দেয়ার অশুভ তৎপরতা শুরু হয়। সেই তৎপরতাই আজো চালাচ্ছেন একশ্রেণীর অসৎ ও ভণ্ড রাজনীতিবদ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে এই মিথ্যাচারের বর্ণনা

www.pathagar.com

অহরহ শুনতে হচ্ছে আমাদের। এই মিথ্যাচারের কথা বলতে গিয়ে বিনিয়োগবোর্ডের সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত কলামিস্ট মাহমুদুর রহমান বলেন:

'১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কে ইসলামের ওপর সেক্যুলারিজমের বিজয় হিসাবে দেখানোর প্রবণতা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। কিছুদিন আগেও 'ইটিভি' টেলিভিশন চ্যানেলের এক টকশোতে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহরিয়ার কবির চরম উস্কানিমূলকভাবে বললেন, 'সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি তার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে, এ রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন নেই। এটাই যদি ইসলামী রাষ্ট্র হবে, তবে কেন আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করলাম। পাকিস্তান কেন আমরা ভাঙলাম। আমরা যদি ইসলামী হুকুমতই কায়েম করতে চাই পাকিস্তানতো আমাদের জন্য ভাল ছিল। বড় দেশ ছিল। আমরা একটা secular democracy চেয়েছিলাম বলেই মুক্তিযুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন করেছিলাম।'

ঘাদানিক নেতার বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশ যেহেতু স্বাধীন হয়ে গেছে কাজেই ইসলামের আর কোন স্থান এই দেশে নেই। কতজন মুক্তিযোদ্ধা তার এই বক্তব্যের সাথে একমত হবেন তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।' (নয়াদিগন্ত ১৯ ডিসেম্বর)।

তাঁর এই সন্দেহের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। কারণ একাত্তরের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধারা জানতো না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তারা বরং জানতো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির যুদ্ধ।

পতাকা বদল হলো, কিন্তু বদল হলো না শোষণের প্রক্রিয়া

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের পতাকা বদল হলো, ক্ষমতার বদল হলো, কিন্তু বদল হলো না শোষণের প্রক্রিয়া। পাঞ্জাবী শোষকের জায়গায় এলো বাঙালি শোষক। আমাদের জীবন-মান দুর্বিসহ থেকে আরো দুর্বিসহ হলো। চৌদ্দ আনা দরের চাল হল চৌদ্দ টাকা, তারপর হলো আটাশ টাকা, তারপর বত্রিশ টাকা। এভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়লো লাফিয়ে লাফিয়ে কিন্তু তার সাথে তাল রেখে আয় বাড়লো না আমাদের। আমরা সাধারণ মানুষ আরো সাধারণ হলাম কিন্তু যাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলাম তারা সাধারণ থেকে হয়ে গেলেন অসাধারণ। আমাদের সম্পদের পরিমাণ কেবল কমলো আর তাদের সম্পদ এতটাই বাড়লো যে, তারা এখন নিজেরাই বলতে পারছে না তাদের সম্পদের পরিমাণ কতো। তাদের বালিশের ভেতর টাকা, চালের ড্রামে টাকা, রান্নাঘরে টাকা, ড্রয়িংরুমে টাকা, সর্বত্র

www.pathagar.com

কেবল কোটি কোটি টাকা।

কিভাবে এই টাকার মালিক তারা হলো তার একটি সরস বর্ণনা দিয়েছেন মুক্তবুদ্ধির ধারক বলে খ্যাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কলামিস্ট আহমদ ছফা। দৈনিক ইত্তেফাকের ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা থেকে জানা যায়:

'উনিশশ' একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বরের পরে ভারতীয় বাহিনীর পেছন পেছন আওয়ামী লীগের লোকেরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে ক্ষমতার আসনে গ্যাঁট হয়ে বসে। তাদেরকে কোন রকম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। পাছে অন্যরকম কোনকিছু ঘটে এজন্য অনেকদিন পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী তাদের চারদিকে পাহারা দিয়েছে। নিরুপদ্রবে যাতে একটি দল রাজ্য ভোগ করতে পারে, সেজন্য প্রকৃত সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন! ..... পার্টির লোকেরা দেশে প্রবেশ করে মনের আনন্দে গুলি ছুড়েছে, অনেক সময় দেশের নাম করে ব্যক্তিগত শত্রুদের নিঃশেষ করে দেবার জন্য এবং বিহারীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করার জন্য রাইফেল, এলএমজি'র ব্যবহার করলেও বিরোধিতার কারণে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার তাদের একেবারেই করতে হয়নি। পাকিস্তানি সৈন্যদের আগেই ভারতে চালান করে দেয়া হয়েছে এবং কলাবরেটররা অনেকে ধরা পড়েছে এবং অনেকে সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়েছে। তাই টু-শব্দটি উচ্চারণ করার কোন মানুষ ছিল না। তারা ইচ্ছেমতো লুটপাট করেছে। পরিত্যক্ত বাড়িঘর যার যা পছন্দ হয়েছে দখল করে নিয়েছে। গাড়ি-ঘোড়া যা পেয়েছে নিজেরা নিয়ে নিয়েছে। দেখা গেল, উনিশ শ' একাত্তরের আগে যাদের ধন-সম্পদ, চরিত্র এবং বিদ্যা এসবের কিছুই ছিল না, বাহাত্তরের মধ্যে দেখা গেল তারা একেকজন দু'তিনটা করে প্রাইভেট কার রাখে, চার-পাঁচটা করে বাড়ির মালিক, এবং নগদ টাকার অন্ত নেই। শুধু লুটপাট নয়, সরকারি আইনের সুযোগ নিয়ে লাইসেন্স-পারমিট ইত্যাদি বাগিয়ে দলের নিরীহতম মানুষটিও টাকার গাছে পরিণত হয়েছে।

এরা একবার উনিশ শ' একাত্তর সালে তথাকথিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিহারিদের গাড়ি-বাড়ি, টাকা-পয়সা লুট করেছে, তাদের হত্যা করেছে। তাদেরই একাংশ পাকিস্তানি সৈন্যের আক্রমণের পর ব্যাংক এবং ট্রেজারির কোটি কোটি টাকা লুট করে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। এই আওয়ামী লীগের আরেকটি ক্ষুদ্র অংশ দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তা করেছে। আর কেউ কেউ ভারতীয় বাহিনীর পিছু পিছু দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাড়ি-গাড়ি দখল, দোকান-পাট হস্তগত করা থেকে শুরু করে নারী নির্যাতন পর্যন্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে দেশপ্রেমের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতেও শেষ নয়। দেশের যা কিছু সম্পদ যেমন পাট, চামড়া ইত্যাদি এবং অন্যান্য জিনিস অবশিষ্ট

www.pathagar.com

ছিল রাতারাতি ভারতে পাচার করে দিয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করল। দেশে কল-কারখানা বিশেষ নেই, তবু অল্প-স্বল্প যা আছে তার যন্ত্রপাতি খুলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দিল। .... এত লুট তবু সোনার বাংলার সম্পদ শেষ হয় না। তারপরও কলকারখানা যেগুলো ছিল সেগুলোতে ধরে ধরে নিজের দলের লোকদের চালক বানিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দিল। বাস্তবিকই পল্টনের এক হুংকারে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।'

তারপর শুরু হলো সমাজতান্ত্রিক শোষণের প্রক্রিয়া। সে শোষণ ও তার প্রক্রিয়া আরো ভয়াবহ।

শোষণ চললো সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে

এই শোষণ চললো সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনার দোহাই দিয়ে। শোষণের প্রতিযোগিতায় তারা পাকিস্তানি শাসকদেরও হারিয়ে দিল। শোষণের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল নিত্যনতুন সংকট ও সমস্যা। আহমদ ছফার ভাষায়:

'সেই সরকার এবং তার কনিষ্ঠ অংশীদারটি মিলে যখন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র পুরোপুরি পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল, সংকটগুলোও সাবালগ হয়ে চোরাগলি থেকে রাজ-পুরুষের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে আমরা।' (দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭)।

তারপর থেকে সমানে শুরু হল খাদ্য সংকট, বস্ত্র সংকট, ওষুধ সংকট, শিক্ষা সংকট ইত্যাদি সংকটমালার অফুরন্তভান্ডার। এগিয়ে চলল সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা। ব্যাংক-বীমা ও কল-কারখানা সব জাতীয়করণ করা হলো। সমাজতন্ত্র তার চূড়ান্ত সাফল্য হিসাবে উপহার দিল চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ। রাজপথে লাশের স্তুপ জমা হয়ে গেল। কলাপাতা আর মাছ মারার জাল দিয়ে লজ্জা নিবারণ করলো বাসন্তিরা।

সমাজতন্ত্রের এই অগ্রযাত্রার আরো বর্ণনা দিয়েছেন জনাব আহমদ ছফা। তিনি জানিয়েছেন:

'সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ক্রিয়া চালু করার ভার যাদের ওপর দেয়া হলো তারা নিজেরা লুট করলো, কারণ তাদের একমাত্র লুটের অভিজ্ঞতাই আছে। কল-কারখানা চালাবার অভিজ্ঞতা তাদের কস্মিনকালেও ছিল না। এই বেপরোয়া লুটপাটে পাছে কর্তা ব্যক্তিরা রাগ-বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাই কর্তাদের আসা-যাওয়ার পথে শ্রমিকদের দিয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়াবার ব্যবস্থা করলেন। কর্তারা খুশি হয়ে ব্যাংক থেকে তিন মাসের মাইনে আগাম দেয়ার নির্দেশ দিলেন, ওদিকে কল-কারখানা বন্ধ রইল তো রইলই। দেশে টাকা-পয়সার দারুণ অভাব, তাই বস্তা বস্তা কাগজের নোট ছেপে বাজারে ছেড়ে দেয়া হলো। টাকা ছেপে বাজারে চালু করার খেলাটি এতই চমৎকার যে, আমাদের বন্ধুরাও তাদের দেশে মুদ্রিত এক

www.pathagar.com

টাকার অনুকরণে জাল নোট তৈরী করে বাজারে ছেড়ে দিলেন। তাঁরা দীর্ঘ নয় মাস কালব্যাপী বাংলাদেশ সরকারের আতিথ্য দান করেছে, রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রী মহোদয়ের সেবা করেছে, নিশ্চয়ই তাদের সে অধিকার আছে।

এসব নিয়ে কেউ যদি হ্যাঁচ্ছো করত, অমনি বলা হত কলাবরেটর, রাজাকার, আলবদর, চীন এবং পাকিস্তানের শত্রু।... সরকারের কোন সমালোচনা করলেই নির্ঘাত মৃত্যু। বিচারকরা আদালত পর্যন্ত টেনে নেয়ার কষ্টও স্বীকার করবে না, এত নির্ভুল বিচারক।.... যারা ভারত ও রাশিয়ার সদিচ্ছাতে বিশ্বাস করে না তারা অতি খারাপ লোক– এত খারাপ যে, নিশ্চয়ই আলবদর, রাজাকার, মুসলিম বাংলা এবং চীনের দালাল না হয়ে যায় না। তাদের ভাষায় আমরা এবং আমাদের পাছায় কড়া লাথি মারতে পারে যে সরকার সে সরকার ছাড়া আর সকলেই সমাজতন্ত্র এবং স্বাধীনতার ঘোর শত্রু।' (দৈনিক ইত্তেফাক, বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০৭)।

একদিকে দুর্ভিক্ষের কারণে অগণিত অনাহারী মানুষের করুণ মৃত্যু আর অপরদিকে সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিরোধী নিধনের নামে চললো বেধড়ক হত্যা ও সন্ত্রাসের অবাধ রাজত্ব। সমাজতন্ত্রের এই অগ্রগতি ও জয়জয়কার দেখে প্রখ্যাত বাম নেতা রাশেদ খান মেনন দুঃখ করে বলেছেন:

'সমাজতন্ত্রের অপপ্রয়োগে এক ধরনের অবাধ লুটপাটতন্ত্রের জন্ম দেয়া হয়েছিল। এই লুটপাটতন্ত্রই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পুরনো কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন শাসনামলে বর্ধিত হয়ে এখন অর্থনৈতিক মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট এই লুটপাটতন্ত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনবৈষম্য, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলছে। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে।' (নয়া দিগন্ত ঈদ সংখ্যা ২০০৭)।

মুক্তিযুদ্ধের রক্তের সাথে বেঈমানী

এখানেই থেমে থাকলো না তাদের অপরাধ কর্ম। তারা সবচে মারাত্মক যে অপরাধ করলো তা হলো মুক্তিযুদ্ধের রক্তের সাথে বেঈমানী। তারা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের মিথ্যা পরিসংখ্যান দেখিয়ে বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য আনলো। সেই সাহায্য পেল না মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। লুটপাটতন্ত্র এত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করলো যে, শোনা যায়, সাত কোটি বাঙালির জন্য আট কোটি কম্বল এনেও শেখ মুজিব নিজেই নাকি বঞ্চিত হয়েছিলেন সেই কম্বল থেকে। তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন: *'সবাই পায় সোনার খনি আর আমি পেলাম চোরের খনি।'* এই খনির দাপটে এলো চুয়াত্তুরের দুর্ভিক্ষ। রাজধানীর ফুটপাতগুলো ভরে উঠলো বেওয়ারিশ লাশের মিছিলে। সারাদেশে হাহাকার আর কান্না।

www.pathagar.com

সন্তানকে খাবার দিতে না পেরে তাদের গলা টিপে হত্যা করে আত্মহত্যা করলো বাপ-মা। এ রকম হৃদয়বিদারক অসংখ্য ঘটনা ঘটলো। কিন্তু এই লুটেরা শাসকরা লুটপাটে এতই ব্যস্ত রইলো যে, মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি তাদের যে কিছু কর্তব্য আছে সে কথা মনে করারও সময় পেলো না তারা।

বিগত ৩৬ বছর ধরে এ খেলাই চলছে। ক্ষমতার বার বার হাত বদল হলেও এখনো পর্যন্ত শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পর্যন্ত প্রকাশ করেনি কোন সরকার। না 'জাতির পিতার' সরকার, না 'স্বাধীনতার ঘোষকের' সরকার। 'যাদের রক্তে মুক্ত দেশ' এ জাতির সন্তানরা এখন জানে না তাদের নাম। ইতিহাস থাকলে হয়তো দেখা যেতো, তার নিজের গ্রাম বা ইউনিয়নেই ছিল কোন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা; যাকে নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। কিন্তু না, কোন শাসকই আমাদের রক্তের উত্তরাধিকারকে চিনতে দেয়নি। শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত ও ত্যাগের এই হচ্ছে পরিণতি। এটা কি মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, নাকি ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা এ প্রশ্ন আজ নতুন প্রজন্মের প্রতিটি নাগরিককে তাড়িয়ে ফিরছে।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি তালিকা করা খুব কঠিন, জটিল বা ব্যয়বহুল কাজও নয়। আমাদের দেশটি খুব বড় নয়। আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও খুব দুর্বল নয়। এ দেশের প্রতিটি বাড়ি, পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত। ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়ি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নখদর্পনে। এ কাজটি করার জন্য দরকার শুধু রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের। মাত্র এক মাসের মধ্যে এখনো এ তালিকা করে ফেলা সম্ভব, কারণ এখনো গ্রামের যেসব মুরুব্বীরা বেঁচে আছেন তারা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধের সময় সে গ্রামের কারা কারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন, কারা পাক বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন, কারা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়েছেন, কারা সে সময় পাক বাহিনীর দালাল ছিল এবং তাদের কত জন মারা গেছে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে মুক্তিযোদ্ধারা কতজন দালাল ও রাজাকারকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে এই তালিকা সংরক্ষণ করা উচিত। সম্ভব হলে সেই তালিকা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে টাঙ্গিয়ে রাখা উচিত। তাহলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে তার গ্রাম বা তার ইউনিয়নেও মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তারা সেই মুক্তিযোদ্ধার নাম নিয়ে গর্ব করতে পারবে। এই স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করতে না পারলে আগামী প্রজন্ম হাতের কাছে এমন কিছু পাবে না যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি না করে অতীতের সবকটি সরকার দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে অলীক মিথ্যাচারের ঘূর্ণাবর্তে আজো ডুবিয়ে রেখেছে। জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের এতবেশী মিথ্যা ইতিহাস শোনানো হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের সাথে পরিচিত করানোই আজ এক বিরাট সমস্যা। যারা মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

শহীদদের নিয়েও মিথ্যাচার করতে পারে তারা আর কোন্ ব্যাপারে সত্য উচ্চারণ করবে? কেন করবে? যা বললে তাদের সুবিধা হবে তারা শুধু তাই বলেছে এবং এখনো বলছে; তাদের চোখে তাই সত্য যা তাদের স্বার্থের অনুকূল আর যা তাদের স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তা সবই মিথ্যা।

স্বাধীনতার পর জাতি তিনটি যুগ তাদের সুযোগ দিয়েছে এই বেঈমানি ও মিথ্যাচার বন্ধ করে সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য। কিন্তু সে সুযোগ তারা গ্রহণ করেনি। এখনো তারা মিথ্যাচারের কোরাস গাইছে। কিন্তু যে শিশুটি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছে তার বয়স এখন ৩৬ বছর। সে এখন টগবগে যুবক। স্বাধীন দেশের স্বাধীন যুবক কেন মিথ্যার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে? তাই আজ তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে মুক্তিযুদ্ধের সত্য-সঠিক ইতিহাস। এ ইতিহাস তারা খুঁজে বের করবেই। প্রয়োজনে মিথ্যা ইতিহাসের নায়কদের দাঁড় করাবে ইতিহাসের কাঠগড়ায়।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী সোমবার পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে আসার পথে লন্ডনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট শেখ মজিবুর রহমানের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি জানতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা কত? জবাবে শেখ মজিবুর রহমান 'থ্রি মিলিয়ন' ৩০ লাখ উল্লেখ করলে ডেভিড ফ্রস্ট প্রশ্ন করেছিলেন:

নিহতদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ (থ্রি মিলিয়ন) এ কথা আপনি সঠিকভাবে জানেন?'

শেখ মুজিব সেদিন বলেছিলেন: *'আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনও আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি।'*

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বয়স তখনও এক মাস পূর্ণ হয়নি। সে অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আশাও করা যায় না। ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের জবাবে শেখ মজিবুর রহমান যথার্থই বলেছিলেন: *'এখনো আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি'।* তবে তিনি আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন: *'আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করছে'।* দেশবাসী আশা করেছিল, শিগ্রই এ তথ্য সংগ্রহ শেষ হবে, জনগণ একদিন জানতে পারবে, কারা তাদের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে গেছে। কিন্তু তারপর? তারপর তো ৩৬টি বছর পার হলো, কোথায় সে তালিকা? শেখ মুজিব যাদের তথ্য সংগ্রহে লাগিয়েছিলেন তাদের সে তথ্য সংগ্রহ কি এখনো শেষ হয়নি? নাকি স্বাধীনতা বিরোধী কোন শক্তি সে সংগৃহীত তথ্য গায়েব করে দিয়েছে? নাকি মিথ্যাচারের পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য সেই লুটেরা শাসকরা এই তালিকা ঢুকিয়ে দিয়েছে কোন ডিপফ্রিজে?

www.pathagar.com

এই তথ্য সংগ্রহকারীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা যেমন জানতে পারেনি জনগণ তেমনি জানতে পারেনি এই তথ্য সংগ্রহের কি হয়েছিল। তারা কি তথ্য সংগ্রহ সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন? পেরে থাকলে শহীদের সংখ্যা কততে দাঁড়িয়েছিল? যুগ যুগ ধরে এসব প্রশ্ন জনমনে তোলপাড় করলেও এর কোন সদুত্তর মেলেনি। শেখ মুজিব সেদিন ডেভিড ফ্রস্টকে বলেছিলেন, 'এখনও আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি।' তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিশ লাখ বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত কখন কারা নিয়েছিলেন? এই সংখ্যার সত্যতা কতটুকু?

এ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির। তিনি ছিলেন তখন কার্যত অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের স্পোকস্‌ম্যান। তার ভাষায়:

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে, রেডিও, টিভি, মুভি ইন্টারভিউ-এ এবং সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা দেয়ার সময় সাংবাদিকগণ আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করেছেন– বাংলাদেশে একাত্তুরে কত মানুষ শহীদ হয়েছেন? সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে কখনও 'থ্রি মিলিয়ন' আবার কখনও বা 'ফোর মিলিয়ন' বলেছি।'

তিনি জানান:

'লন্ডনে প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট-এর নিকট বঙ্গবন্ধু যখন 'থ্রি মিলিয়ন' শহীদ হওয়ার কথা বলেছিলেন, তারও আট মাস আগে মুজিবনগরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানের নির্দেশে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভাতে রেডক্রসের সদর দপ্তরে পাঠানোর জন্য ৫ই মে, ১৯৭১ বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির সেক্রেটারী এম. ফখরুল হোসেন যে টেলিগ্রামটি টাইপ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশের মিলিটারী ক্র্যাকডাউনে 'থ্রি মিলিয়ন' (৩০ লাখ) শহীদ হওয়ার কথাই লিখেছিলেন।

এরপর কূটনৈতিক মিশনে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, আফগানিস্তানের কাবুল থেকে বাসে ইরানের তেহরান পৌঁছানোর পর ১০ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রাতে তেহরানের ভারতীয় দুতাবাসে রাষ্ট্রদূত এম.এ. রহমানের অফিস কক্ষে বসে তারই টাইপ মেশিন ব্যবহার করে ইরানের শাহেনশাহ মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভীর নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৫ পৃষ্ঠার যে চিঠিখানা ইরানের প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোভায়দার নিকট লিখেছিলাম, তাতেও আমি বাংলাদেশে মিলিটারী ক্র্যাকডাউনে 'ফোর মিলিয়ন' (৪০ লাখ) শহীদ হয়েছেন লিখেছিলাম।'

তিনি আরো জানান:

www.pathagar.com

'বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে আসার পথে লন্ডনে প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের জবাবে যখন বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'থ্রি মিলিয়ন' (৩০ লাখ) শহীদ হওয়ার কথা বলেছিলেন তখন সেটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ জেনেছিলেন। তখন থেকে সংবাদপত্রে, টিভি, রেডিও ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখার সময় বাংলাদেশের সকল নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হওয়ার কথাই সব সময় বলেছেন।

যেহেতু বঙ্গবন্ধু শহীদ-এর সংখ্যা '৩০ লাখ' বলেছিলেন, তাই জাতির জনকের মুখ থেকে বের হওয়া উক্ত সংখ্যাটিকেই দেশবাসী স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সঠিক সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে আজ সেই সংখ্যাটিই চালু আছে।'

এরপর তিনি জানিয়েছেন:

'পচিশ বছর আগে 'মিলিয়ন' এবং 'বিলিয়ন' শব্দ দুটি বিদেশে বহুল প্রচলিত থাকলেও আমাদের দেশে ঐ ইংরেজি শব্দ দুটির ব্যবহার তখন খুবই সীমিত ছিল বিধায় একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার ধারনা ছিল যে, 'এক মিলিয়ন' -এর অর্থ হচ্ছে 'এক লাখ'। আসলে এক মিলিয়নের অর্থ যে 'দশ লাখ' তা তখন জানতাম না। একাত্তরে আমি যখন বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে 'থ্রি মিলিয়ন' শহীদ হওয়ার কথা বলেছিলাম তখন আসলে 'তিন লাখ' শহীদ হওয়ার কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার অজান্তেই ৩০ লাখ শহীদ হওয়ার কথা বলেছিলাম।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসাবে 'থ্রি মিলিয়ন' শব্দটি প্রথম ভুলবশতঃ ব্যবহার করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনিই এ সংখ্যাটি প্রচার করেছিলেন। রেডক্রসের হেড অফিসে যে তথ্য পাঠানো হয়েছিল তাও তারই পরামর্শে। পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তার দেয়া তথ্যটিকেই সঠিক মনে করে প্রচার করেছিলেন শেখ মজিবুর রহমান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছিলেন: *'আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনও আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি।'*

অতএব মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সঠিক সংখ্যাটি নিরূপণের অবকাশ ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান সে অবকাশ রেখেই সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এতে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ প্রজ্ঞার কি মূল্য দিল পরবর্তী সরকারগুলো? স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করার দায়িত্ব ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারগুলোর। এ কাজটিই যেহেতু করেনি তাহলে কি দরকার ছিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার? কি দরকার ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রকাশের?

www.pathagar.com

কি কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর? এ জাদুঘরে গেলে আমরা কি পাবো শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা? আমার গ্রাম, আমার এলাকার কে কে শহীদ হয়েছিলেন পাবো কি সে তথ্য? অথচ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রকল্প বা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজই ছিল মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান নির্ণয় করা।

এটা খুব কঠিন, জটিল বা ব্যয়বহুল কাজও নয়। আমাদের দেশটি খুব বড় নয়। আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও খুব দুর্বল নয়। এ দেশের প্রতিটি বাড়ি, পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত। ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়ি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নখদর্পনে। এ কাজটি করার জন্য দরকার শুধু রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের। মাত্র এক মাসের মধ্যে এখনো এ তালিকা করে ফেলা সম্ভব, কারণ এখনো গ্রামের যেসব মুরুব্বীরা বেঁচে আছেন তারা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধের সময় সে গ্রামের কারা কারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন, কারা পাক বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন, কারা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়েছেন, কারা সে সময় পাক বাহিনীর দালাল ছিল এবং তাদের কত জন মারা গেছে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে মুক্তিযোদ্ধারা কতজন দালাল ও রাজাকারকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে এই তালিকা সংরক্ষণ করা উচিত। সম্ভব হলে সেই তালিকা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে টাঙ্গিয়ে রাখা উচিত। তাহলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে তার গ্রাম বা তার ইউনিয়নেও মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তারা সেই মুক্তিযোদ্ধার নাম নিয়ে গর্ব করতে পারবে। এই স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করতে না পারলে আগামী প্রজন্ম হাতের কাছে এমন কিছু পাবে না যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির বলেছেন 'তিন লাখ' মনে করেই তিনি 'থ্রি মিলিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই শব্দটিই জেনেভা রেডক্রস অফিসের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে জানানো হয়েছে। পাকিস্তান ফেরত শেখ মুজিবুর রহমান এর ওপর ভিত্তি করেই 'থ্রি মিলিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ফলে এটা পরিষ্কার যে, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের কথা কেউ তখন কল্পনাও করেননি; এটি বাংলা থেকে ইংরেজী করার সময় অজ্ঞতাবশতঃ হয়ে গেছে। এই সত্য উচ্চারণের জন্য জাতি মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের কাছে কৃতজ্ঞ। সত্য উচ্চারণে লজ্জা নয় বরং মহত্ব আছে। সবাই জানেন, কোন ঘটনা ঘটলে মানুষ যখন তা রটনা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাতে অতিরঞ্জনের কিছুটা প্রলেপ পড়ে। মুহাম্মদ নূরুল কাদির নিজেও বলেছেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংখ্যাটি বাড়িয়ে বলার ব্যাপারে তার একটি আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল।

www.pathagar.com

তার মানে তিনি যখন 'তিন লাখ' বলেছেন তখন এই সংখ্যা হয়তো ছিল লাখ খানেক। এই লাখ খানেক লোকের তালিকা করতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারগুলো কেন ব্যর্থ হলো তা নিঃসন্দেহে এক রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। বিষয়টি কি এ জন্যই করা হয়নি, তাতে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদদের মিথ্যাচারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে? এ জন্যই কি শেখ মুজিব কথিত কমিটির রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি? কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে চাইলেই কি কেউ সত্য গোপন করে রাখতে পারে? দেশী-বিদেশী গবেষকদের সত্য-সন্ধানী চোখ শেষ পর্যন্ত আসল সত্য উদ্ধার করেই ছাড়ে– যদিও মিথ্যুকরা চায় না জনগণ আসল সত্য জেনে যাক।

একাত্তরের গণহত্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গবেষণা

এ ব্যাপারে দুটি বিদেশী সংস্থার গবেষণা কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। এর একটি হচ্ছে COW (Co-relates of war) ও অন্যটি বিশ্বের বহুল পরিচিত Harvard Univercity. নিউইয়র্কের COW (Co-relates of war) -এর মতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের কারণে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার)-এর মত লোক প্রাণ হারিয়েছে। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ছিল আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তারা ২৫ মার্চের রাত থেকে নিহতের সংখ্যা গণনা শুরু না করে বরং সত্তরের নির্বাচনের পর যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভারতের ইন্ধনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে বিভেদের বীজ চূড়ান্তভাবে প্রোথিত করার জন্য বিহারী হত্যার মধ্য দিয়ে যে হত্যা কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল সেখান থেকে নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হিসাবটি সমাপ্ত না করে বিজয় পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা বিরোধী ও আলবদর রাজাকার বলে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদেরও গণনা করা হয়েছিল।

হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অবাঙ্গালী, বিহারী, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার-আলবদর, শান্তিকমিটির সদস্য, গণহত্যার শিকার সাধারণ মানুষ– সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনায় প্রায় দুই লাখ লোক নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। অবশ্য তারা মন্তব্য করে, এই দুই লাখ নিহত সংখ্যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার তুলনায় অবাঙ্গালী, বিহারী এবং ১৬ ডিসেম্বরের পর পরাজিত শক্তির সংখ্যাই অধিক। তুলনামূলকভাবে সবচে কম মারা গেছে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা। কারণ তারা যুদ্ধ করেছে গেরিলা পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে কম লোক ক্ষয়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রাখা যায়। এ সময় অধিকাংশ লোক মারা গেছে গণহত্যার শিকার হয়ে। মুক্তিযোদ্ধারা কোন এলাকায় পাক আর্মির ওপর অপারেশন চালিয়ে সরে পড়ার পর বিক্ষুব্ধ পাকবাহিনী সেই এলাকায় গিয়ে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করেছে। অধিকাংশ বাঙালি নিহত হয়েছে এ ধরনের অপারেশনে।

www.pathagar.com

বিহারীদের জবান পাকিস্তানিদের মত উর্দু থাকায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন তারা বাঙালিদের আক্রোশের শিকার হয় তেমনি ১৬ ডিসেম্বরের পর রাজাকার, আলবদর, শান্তিকমিটির লোকদের পালাবার মত কোন জায়গা না থাকায় তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ এ সময় নিহত হয়।

কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে চাইলেই কি কেউ সত্য গোপন করে রাখতে পারে? দেশী-বিদেশী গবেষকদের সত্য-সন্ধানী চোখ শেষ পর্যন্ত আসল সত্য উদ্ধার করেই ছাড়ে– যদিও মিথ্যুকরা চায় না জনগণ আসল সত্য জেনে যাক।

যাইহোক, যদি Harvard Univercity-র মতে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনায় দুই লক্ষ নিহত সংখ্যাটিকে আপাতত সঠিক ধরা হয় এবং COW (Co-relates of War) মতে পাক হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীদের হাতে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার)-বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে ধরে নেই তাহলে অবাঙ্গালী ও স্বাধীনতা বিরোধী পরাজিত শক্তির নিহতের পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় লাখ।

শোনা যায়, শেখ মুজিব যাদের তথ্য সংগ্রহে লাগিয়েছিলেন তারা গ্রামভিত্তিক শহীদদের একটি তালিকা তৈরী করেছিল। কিন্তু তাতে শহীদের সংখ্যা সাকূল্যে মাত্র হাজার দশেক হওয়ায় সে তালিকা আর প্রকাশ করা হয়নি। এরপর স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়ার সরকার এবং স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও শহীদদের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারাও শহীদদের সংখ্যা দশ হাজারের অধিক খুঁজে পাননি। যেখানে সারা বিশ্বে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখ বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে সেখানে দশ হাজারের তালিকা প্রকাশ করলে জাতিগতভাবে বিশ্ব আমাদের কি ভাববে এই লজ্জায় শেষ পর্যন্ত কোন সরকারই শহীদদের সেই তালিকা আর প্রকাশ করেননি।

সরেজমিনে যারা তথ্য সংগ্রহ করলো তাদের হিসাবটি যদি ভুল বা মিথ্যা হয় তাহলে সঠিক পরিসংখ্যান এবং সত্য তথ্য দিয়ে এ বিভ্রান্তি দূর করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই বিভ্রান্তি দূর করতে কোন সরকারই এগিয়ে আসেনি।

একটি ভুলের ওপর কোন জাতি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না

একটি ভুল হিসাব ও মিথ্যা তথ্যের ওপর একটি জাতি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ভুল মানুষেরই হয়। কিন্তু ভুলকে ভুল জানার পর শুধরে নেয়াটাই সততার দাবী। এ সততা আমাদের রাজনীতিবিদরা দেখাতে পারেননি। তারা আমাদের ক্রমাগত মিথ্যাচারের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কোন পরিসংখ্যান না দিয়ে মিথ্যাচারের মাধ্যমে

www.pathagar.com

তারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছেন। এই রাজনীতিবিদরা মুক্তিযুদ্ধের দাবীদার হয়েও স্বাধীনতার ৩৬ বছরে শহীদদের কোন তালিকা জাতিকে উপহার দিতে পারেননি। এটা যদি তাদের ব্যর্থতা হয় তবু তারা জনগণের অনুকম্পা পাওয়ার অযোগ্য। যদি ইচ্ছে করেই তারা এটি করে থাকেন তবে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

বর্তমান তত্তাবধায়ক সরকার অনেকগুলো ভাল কাজে হাত দিয়েছেন। তারা দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন, জঙ্গীবাদ নির্মূলে ভূমিকা রাখছেন, দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন। আগেই বলেছি, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা করা খুব সময় সাপেক্ষ, ব্যয় সাপেক্ষ বা জটিল কাজ নয়। একটি প্রশাসনিক ঘোষণার মাধ্যমেই এ ঐতিহাসিক কাজটি সমাধা করা যায়। নিশ্চয়ই সরকার স্বীকার করবেন, মুক্তিযুদ্ধের সত্য তথ্য জানার অধিকার দেশের মানুষের আছে। কিন্তু এই সত্য তথ্য দেয়ার ব্যাপারে অতীতের কোন সরকারই কার্যকরী কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

কেন করেননি তাও তারা জাতিকে জানাননি। মুক্তিযুদ্ধ না হলে এবং এইসব শহীদদের রক্তে বাংলার মাটি লাল না হলে এই ৩৬ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের পক্ষে ক্ষমতায় গিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়া সম্ভব হতো না। বর্তমান তত্তাবধায়ক সরকার এইসব দুর্নীতিবাজ শাসকদের দুর্নীতির বিচার করার কথা বলছেন। কিন্তু তারা যে শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানী করেছে, জাতিকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে তার বিচার কে করবে? একটি জাতিকে যারা ৩৬ বছর ধরে মিথ্যার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে তাদের কি কোন বিচার হবে না?

আমাদের উচ্চকণ্ঠ রাজনীতিবিদরাও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকার দাবী কখনো উত্থাপন করেনি। তারা বরাবর চলমান সরকারের হালুয়া-রুটি বা বিভিন্ন দুতাবাসের দান-দাক্ষিণ্য গ্রহণকেই তাদের মূল কাজ বিবেচনা করেছেন। জাতিকে বিভ্রান্তমুক্ত করতে তারা কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেননি। আওয়ামী লীগ এ দায়িত্ব পালন না করায় জাতির ক্রোধ ও ক্ষোভের অনল তাদের ঘিরে ধরেছিল, এবং তার খেসারত হিসাবে ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়েছিল তারা। জনগণ সত্য তথ্যের প্রত্যাশায় এরপর স্বাধীনতার ঘোষকের হাতে তুলে দিয়েছিল দেশের শাসনভার। কিন্তু তিনি বা তাঁর দল সত্য প্রকাশ করে আওয়ামী লীগের রোষানলে পড়ার ঝুঁকি নিতে সাহস পায়নি। এভাবে বার বার ক্ষমতার পালাবদল হলেও জনগণের কাঙ্খিত মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস এখনো জনগণের অজানাই রয়ে গেছে। রাজনীতিবিদরা এভাবে বার বার কেবল জনগণকে প্রতারিতই করে

www.pathagar.com

চলেছে।

রাজনীতিবিদদের ভন্ডামীর খেসারত রাজনীতিবিদরা দিচ্ছেন। জনগণের চোখে এইসব রাজনীতিবিদরা এখন লুটেরা, মিথ্যুক, প্রতারক আর দুর্নীতিবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি বলে যতই দাবী করুক, তারা যে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ফায়দা লুটায় তৎপর ছিলেন এ সত্য এখন বুঝতে কারো বাকী নেই। মুক্তিযুদ্ধের তথ্য গোপন করে ৩৬ বছরে তারা অনেক ফায়দা লুটেছেন। তাদের কাছে জনগণ এখন তেমন কিছু আর আশা করে না।

আমরা চাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একটি সঠিক পরিসংখ্যান

আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একটি সঠিক পরিসংখ্যান চাই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের একটি গ্রামভিত্তিক তালিকা জানতে চাই। তালিকাটি হতে পারে এরকম:

১. নাম-ধাম ঠিকানা বয়স কোথায় কিভাবে শহীদ হয়েছেন তার উল্লেখসহ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি পূর্ণ তালিকা। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে যে তালিকা সংরক্ষিত থাকবে।

২. যারা মুক্তিযুদ্ধে যাননি কিন্তু পাক বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়েছেন।

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়েছেন; যাদের পরে আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নিহত দালাল ও রাজাকারদের তালিকা।

গ্রামের মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের ব্যবহার করেই এ তালিকাটি করে ফেলা যায়। এ কাজটি সম্পন্ন হলে অনেক অহেতুক বিতর্ক বন্ধ হবে। দেশকে কাঙ্খিত উন্নতির পথে নিতে হলে যে সব বিতর্কের অবসান করা অতি জরুরী। বর্তমান তত্তাবধায়ক সরকার যদি এ কাজটি করে যান তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের মতই এ সরকারও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাদের সব কীর্তি মুছে গেলেও এ কাজটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। সরকার কি বিষয়টির প্রতি একটু নজর দেবেন? জাতিকে মুক্তি দেবেন মিথ্যাচারের বিভ্রান্তি থেকে?

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত বিতর্ক ও কয়েকটি বিবেচনা

১. দেশে এখন যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা কত? কারা এই যুদ্ধাপরাধী? কি এদের নাম-ধাম? এই পরিসংখ্যান কারো জানা নেই। যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী করছেন তাদের কাছে এই পরিসংখ্যান চাইলে তারা বলেন, এটা নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার এই দায়িত্ব একবার পালন করেছিল। তারা এই যুদ্ধাপরাধীদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল ১৯৫ জন। এরা সবাই ছিল পাকসেনা। কিন্তু তৎকালীন সরকার এদের কোন বিচার না করে মুক্তি দিয়ে দেয়। এই মুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণসিং, পাকিস্তানের আজিজ আহমদ এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।

তারপর বিগত ৩৬ বছরে আর কোন সরকার কোন যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত করেনি। ফলে দেশে এখন কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুজাহিদ এ সত্যটি উচ্চারণ করায় তথাকথিত সুশীল সমাজ, একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং এর সূত্র ধরে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তুলেছেন। আমি তাদের ক্ষোভকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু এ জন্য জামায়াতকে কেন নিষিদ্ধ করতে হবে বুঝতে পারি না। যে ১৯৫ জন পাকসেনাকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা হয়েছিল জামায়াত তো তাদের মুক্তি দেয়নি; মুক্তি দিয়েছে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার অপরাধ যদি কেউ করে থাকে সে অপরাধ করেছে আওয়ামী লীগ। ক্ষোভ যদি প্রকাশ করতেই হয় তাহলে সে ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অথবা আওয়ামী লীগের পক্ষে যিনি যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই ড. কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে। তা না করে এই দায়ভার জামায়াতের ঘাড়ে চাপানোর কেন যে এত কসরত তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সত্যি মুশকিল।

২. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়াটা কোন অন্যায় নয়। অন্যায় হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ এনে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হয়রানি করা। শাহরিয়ার কবির, হাসানুল

www.pathagar.com

হক ইনু এবং অন্যান্য বাম রাজনীতিবিদ যারা হঠাৎ করে অনির্বাচিত ও স্বল্পমেয়াদের একটি সরকার, যার মূল কাজ স্বল্পতম সময়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, তাদের কাছে বার বার যে আবদারটি করছেন তা হচ্ছে, নিজামী-মুজাহিদকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। কিন্তু কেন?

যে কাজ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই সম্পন্ন করেছে এবং বিগত ৩৬ বছর ধরে যা নিষ্পত্তি অবস্থায় আছে তা নিয়ে অনির্বাচিত এই সরকারের ওপর হঠাৎ করে এত চাপ কেন? নিজামী-মুজাহিদ যদি হত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ বা লুটপাটের মত অপরাধের সাথে জড়িত থাকতেন তাহলে এই ৩৬ বছরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে আপনারাই বা মামলা দায়ের করলেন না কেন? দেশের একজন নাগরিক হিসাবে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ মামলা করলে ন্যায় বিচার পাবেন না, আমাদের বিচার বিভাগ সম্পর্কে আপনাদের এমন ধারনা হলো কেন? আমরা জানি, সময় যত গড়িয়ে যায় মানুষের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি ততই উপশম ও লাঘব হয়; কিন্তু আপনার পিতৃ বা ভ্রাতৃ খুনের প্রতিশোধ স্পৃহা দীর্ঘ তিন যুগ শীতল ও নিরব থেকে হঠাৎ এই অসময়ে ঝলসে উঠলো কেন? তাতে কি মনে হয় না, কোন অপশক্তির ইঙ্গিতে যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ এনে আপনারা নিরপরাধ ব্যক্তিদের হয়রানি করার চেষ্টা করছেন?

৩. আপনারা যেভাবে নিজামী-মুজাহিদ ও জামায়াত নিয়ে পড়েছেন তাতে এটা পরিষ্কার যে, আপনাদের টার্গেট যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নয়, বিকাশমান ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা রোধ করা। নইলে ২৫ শে মার্চের কালো রাত্রে পাক আর্মি যে হাজার হাজার বাঙালি নিধন করেছিল, দীর্ঘ নয় মাস যারা এ দেশে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের রাজত্ব কায়েম করেছিল, যাদের সাথে ছিল আমাদের মূল লড়াই; বিচার দাবী করার কথা ছিল সেই পাকসেনাদের বিরুদ্ধে। জামায়াত যে মুক্তিযুদ্ধের আসল প্রতিপক্ষ ছিল না তার প্রমাণ ১৬ ডিসেম্বরের রেসকোর্সের আত্মসমর্পনের দলীল। জামায়াতই যদি প্রতিপক্ষ হতো তাহলে জামায়াতকেই আত্মসমর্পনের জন্য বলা হতো। তা যখন বলা হয়নি তখন জামায়াত যে নির্দোষ সেদিনই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, পচানব্বই হাজার পাকসেনাকে যারা ফুলের টোকাটি না দিয়ে ছেড়ে দিল শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করেছে তারা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আসল প্রতিপক্ষ পাকসেনারাই আসল যুদ্ধাপরাধী। এই যুদ্ধাপরাধীদের যারা মুক্তি দিল তাদের বিচার দাবী না করে জামায়াতের বিচার দাবী করার সঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না।

৪. মুক্তিযুদ্ধের আসল যুদ্ধাপরাধী পাকসেনাদের বিচার করা সম্ভব হলে এরপর আসে

www.pathagar.com

তার সহযোগীদের বিচারের প্রশ্ন। যাদের সাথে লড়াই তাদের বিচার করা সম্ভব না হলে তাদের যারা সহযোগী তাদের বিচারের কোন নৈতিক অধিকার থাকে না। দুপক্ষ লড়াই লাগলে সব সময়ই উভয় পক্ষে কিছু সহযোগী জুটে যায়। মূল অপরাধীকে বাদ দিয়ে সহযোগীদের বিচার করার কোন যুক্তি থাকে না। ছোটবেলার ঘটনা। আমাদের গ্রামে একবার বাঘ পড়েছিল। সবাই লাঠি ও বাতি নিয়ে হৈ চৈ করে বেরিয়ে এলে বাঘটি পালিয়ে যায়। বাঘটিকে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় গিয়ে এক লোক বাঘের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করে। লোকটি বাঘ না পেয়ে সেই পায়ের ছাপেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। এতে লোকটির আক্রোশ কিছুটা কমলেও বাঘের কোন ক্ষতি হয়নি। আসল অপরাধীকে বাদ দিয়ে তার সহযোগীদের ওপর আক্রোশ মিটালে তাতে মূল অপরাধীর কিছুই আসবে যাবে না।

৫. আমরা সবাই জানি, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী যেমন ছিল ইন্ডিয়ান বাহিনী তেমনি পাকবাহিনীর সহযোগী ছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনী। বামপন্থীদের দাবী, এইসব সহযোগী বাহিনী গড়ে তুলেছিল জামায়াত; অতএব জামায়াতের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু এখানে যে সত্যের অপলাপ আছে সে তথ্য তারা লুকিয়ে রাখলেও জনগণ জানে, আজকে যেমন আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আছে রাজাকার, আলবদর, আলশামস ছিল তেমনি সরকার নিয়ন্ত্রিত বাহিনী। এসব বাহিনীর কোনটাই কোন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব বাহিনী ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আনসার বাহিনী পূনর্গঠন করে সরকার এই বাহিনী গড়ে তুলেছিল। সরকার এসব বাহিনীতে লোক নিয়োগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন লোকেরই তাতে যোগদান করার সুযোগ ছিল। কোন রাজনৈতিক দল করে না এমন লোকেরা যেমন তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মীও এসব বাহিনীতে চাকরী নিয়েছিল।

চাকরী করা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। এখনো জামায়াতের লোকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অফিসে অন্য দলের বহু সমর্থক কর্মী পাওয়া যাবে আবার অন্য দলের লোকদের অফিসে চাকরী করে এমন অনেকেই জামায়াতের কর্মী সমর্থক। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিলের মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সব লোক আওয়ামী লীগ করে এমন দাবী করা সঙ্গত নয়। চাকরীর পরিচয় এবং রাজনৈতিক পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দুটোকে এক করে ফেলার কোন অবকাশ নেই। তাহলে চাকরীর সুবাদে রাজাকার, আলবদর, আলশামস একাত্তুরে কি ভূমিকা পালন করেছিল তার দায়ভার জামায়াতের ওপর চাপানোর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা কেন? যারা মিথ্যাচারের মাধ্যমে সত্যকে গোপন করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চান এই সত্যগুলো জানেন বলেই তারা কখনো কোন জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেননি।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ভিন্নমত পোষণ আর হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মত অপরাধে জড়িয়ে পড়া এক কথা নয়। একাত্তরে যারা হত্যা, ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনকর্মে জড়িত ছিল বা এসব অপরাধ কর্মে সহযোগিতা করেছিল তাদের নামে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা যায়; কিন্তু স্রেফ রাজনৈতিক ভিন্ন মত পোষণের জন্য কাউকে যুদ্ধাপরাধী বলা কখনো সঙ্গত হতে পারে না। অতএব জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্ত করা কেবল সত্যের অপলাপ নয়, জঘন্য মিথ্যাচারও।

৬. শুধু যুদ্ধাপরাধ কেন, যে কোন অপরাধেরই বিচার চাওয়া উচিত। অপরাধের বিচার না হলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। সামাজিক শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত হয়। কিন্তু যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে একতরফাভাবে জামায়াতকে ঘায়েল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। যারা ৩৬ বছর পর নতুন করে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন তাদের জানা উচিত, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম নিজেই ছিলেন রাজাকার কমান্ডার।

শেখ হাসিনার বিয়াই ছিলেন ফরিদপুরের শান্তি কমিটির নেতা। শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা সাবের হোসেন চৌধুরীর পিতা ছিলেন রাজধানী ঢাকার শান্তি কমিটির নেতা। বার বার ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংগ্রামী সভাপতি মেয়র হানিফের শ্বশুর মাজেদ সরদার একাত্তরে পুরান ঢাকার একচ্ছত্র অধিপতি ও নেতা ছিলেন। শুধু ঢাকা মহানগরী বা কেন্দ্রীয় নেতা নয় থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীই রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটিতে ছিলেন।

বিএনপির অবস্থাও একই রকম। বিএনপির এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ নিজেই ছিলেন পাক বাহিনী ঘনিষ্ট সহযোগী। বিএনপির অনেক মন্ত্রী, এমপি এবং কেন্দ্রীয় নেতার অতীতও একই রকম। খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন পাক সামরিক জান্তার একান্ত ঘনিষ্ঠ একজন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি– বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি রাজনৈতিক দলেরই দলীয় প্রধানের উপদেষ্টা হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা সবাই এসেছেন দালাল পরিবার থেকে। এরপরও কি যুদ্ধাপরাধী হিসাবে জামায়াতকে এককভাবে অভিযুক্ত করার কোন অবকাশ থাকে?

৭. যুদ্ধাপরাধী হিসাবে কাদেরকে অভিযুক্ত করবো? যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর-এর সময়কালে পাক বাহিনীর অনুগত ছিল তারা সবাই কি যুদ্ধাপরাধী? তা বোধ হয় সঙ্গত হবে না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় যদি ৫০ লাখ লোকও ভারতে পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তখন এ দেশে যে সাত কোটি লোক

www.pathagar.com

ছিল তারাতো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পাক বাহিনীর আনুগত্য মেনেই এ দেশে অবস্থান করছিল। একাত্তরের পরে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সাপ্তাহিক হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাহলে কি দেশের ছয় কোটি লোককেই রাজাকার বলবো? অতএব এটা পরিষ্কার যে সে সময় যারা পাক বাহিনীর অনুগত ছিল তারা সবাই রাজাকার নয় এবং স্বাধীনতা বিরোধীও নয়। তাহলে কারা স্বাধীনতা বিরোধী, দালাল, রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধী?

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হচ্ছে, তাহলে যারা বিভিন্নভাবে পাক বাহিনীকে সহায়তা করেছে তারা কি দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী? তাহলে সে সময় যারা পাক বাহিনীর অধীনে সরকারী চাকরী করেছে, অফিস আদালত করেছে, এবং পাক সরকারের পক্ষে কথা বলেছে তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী গণ্য করতে হয়। এই বিবেচনায় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, মরহুম কবি শামসুর রহমান, অধ্যাপক কবির চৌধুরীসহ এমন আরো অসংখ্য নাম করা যায় যাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী গণ্য করতে হয়। কারণ শামসুর রহমান ছিলেন তখন সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানের এক বিশ্বস্ত চাকুরে। তিনি তার পত্রিকায় তখন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীকে দুষ্কৃতকারী বলে উল্লেখ করতেন।

জাহানারা ইমাম ও কবির চৌধুরী নিয়মিত ও দীর্ঘদিন রেডিও পাকিস্তানে কথিকা পড়তেন এবং আলোচনায় অংশ নিতেন। তাদেরকে যদি স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য না করা হয় তাহলে বলতে হয় যারা বিভিন্নভাবে পাক বাহিনীকে সহায়তা করেছে তারা সবাই দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধী নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে যুদ্ধাপরাধী কারা? যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল যুদ্ধাপরাধী কি তারা? যদি এ প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ-সূচক হয় তবে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়নি তাদের বাদ দিয়ে আমরা সেই অস্ত্রধারীদের ব্যাপারে আলোচনায় আসতে পারি।

৮. একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল চারটি শ্রেণী। ক) পাক আর্মি খ) আর্মির সাহায্যকারী আল বদর ও আল শামস বাহিনী গ) পুলিশ বাহিনী ঘ) পুলিশের সহায়তাকারী রাজাকার বাহিনী। কিন্তু এখন যুদ্ধাপরাধী হিসাবে শুধু রাজাকার ও আল বদরদের শাস্তি দাবী করা হচ্ছে কেন? আর্মি এবং পুলিশের শাস্তি দাবী করা হচ্ছে না কেন? আর্মি এবং পুলিশও তো একই কাজ করেছিল? বরং আর্মি এবং পুলিশই ছিল মূল বাহিনী। আলবদর ও আলশামস এবং রাজাকাররা ছিল তাদের সহায়ক বাহিনী। এই প্রজন্মের যারা একাত্তরের ঘটনা পরম্পরা সেভাবে অবগত নন তাদের অবগতির জন্য বলছি, আর্মিকে সহায়তা করার জন্য গঠন করা হয়েছিল আল বদর ও আল শামস বাহিনী।

www.pathagar.com

ইংরেজি বা উর্দুতে আর্মির সাথে মত বিনিময় করতে পারে এমন শিক্ষিত লোকদের নিয়েই এ দুটো বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। অশিক্ষিতদের এ বাহিনীতে নেয়া হতো না। আনসার বাহিনীর অবর্তমানে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল রাজাকার বাহিনী। আল বদররা আর্মির নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাজাকাররা ছিল পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এসব বাহিনীর কোনটিই কোন ব্যক্তি বা দল নিয়ন্ত্রিত বাহিনী ছিল না। এরা সবাই ছিল পাকিস্তান সরকারের অংশ এবং চাকরীর সুবাদে সরকারের নিরেট বেতনভুক কর্মচারী।

তার মানে হচ্ছে, পাক আর্মির বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে আলবদর ও আলশামস বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে রাজাকার বাহিনী। আলবদর, আলশামস ও রাজাকারদের কোন স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। তারা নিয়ন্ত্রিত হতো আর্মি ও পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে। মূল বাহিনীর বিচার না করে সহায়ক বাহিনীর বিচার চাওয়া সভ্যতার ইতিহাসের সবচে বড় ও চাঞ্চল্যকর প্রহসনেরই নামান্তর। যারা এ ধরনের প্রহসনের নাটক মঞ্চায়ন করতে চান ইতিহাস তাদের ভাগ্য কিভাবে নির্ধারণ করে তা দেখার জন্য আমাদের আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

৯. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সবচে বড় বাঁধা ১৬ ডিসেম্বরের আত্মসমর্পনের দলীল। যুদ্ধের এক পক্ষ ছিল বাংলাদেশ অপর পক্ষ ছিল পাকিস্তান। ভারতীয় বাহিনী ছিল আমাদের মিত্র বাহিনী। কিন্তু এই দলীলের বলে যুদ্ধের এক পক্ষ হয়ে গেল ভারত অপর পক্ষ হলো পাকিস্তান। বাংলাদেশ হয়ে গেল ভারতের সহযোগী শক্তি। পাকিস্তানীদের সহযোগী হলো মুজাহিদ, আলবদর ও রাজাকার বাহিনী আর ভারতের সহযোগী হলো মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনী।

এই দলীল বলছে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন বাঙালির কাছে নিয়াজী তথা পাক বাহিনী আত্মসমর্পন করেনি। এক পাঞ্জাবী আত্মসমর্পন করেছে আরেক পাঞ্জাবীর কাছে। পাকিস্তান আত্মসমর্পন করেছে হিন্দুস্তানের কাছে। আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে উপস্থিত হতে না দিয়ে এবং আত্মসমর্পনের দলীলে কোন বাঙালিকে স্বাক্ষর করতে না দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দৃশ্যপট থেকে যারা সরিয়ে দিয়েছিল আগে বিচার হতে হবে তাদের। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকেই কেবল অস্বীকার করা হয়নি; চিরকালের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ভারতের দয়ার দানের স্বাধীনতায় পর্যবসিত করা হয়েছে।

যেহেতু মুক্তিযোদ্ধারাই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং তার একজন সর্বাধিনায়কও ছিল; তাই আত্মসমর্পন দলীলের এক পক্ষ পাকিস্তান হলে অপর পক্ষ

www.pathagar.com

হওয়ার কথা বাংলাদেশ। মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসা ভারতীয় বাহিনী মিত্র বাহিনী হিসাবে সহজেই এই দুইপক্ষের চুক্তিপত্রের স্বাক্ষী হিসাবে এ দলীলে স্বাক্ষর করতে পারতো। সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের ঝগড়ার মিমাংসায় পক্ষ থাকে সে দুই ভাই, মিমাংসাকারী হয় তার স্বাক্ষী। কিন্তু বিড়ালের পিঠাভাগের মত এক পক্ষের সম্পদ পুরোটাই যদি মোড়লের নামে লিখে দিতে হয় তাহলে এই ঝগড়া ও ভাগাভাগির কি দরকার ছিল?

ইস্ট পাকিস্তান ইস্টার্ণ কমাণ্ড নিয়াজীর প্রতিপক্ষ হিসাবে পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পনের যে দলীলে স্বাক্ষর করেছেন তার কোথাও 'মুক্তিযোদ্ধা', 'মুক্তিবাহিনী' বা 'বাংলাদেশ সরকার' শব্দের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। দলীলের কোথাও কোন বাঙালির স্বাক্ষর নেই এমনকি স্বাক্ষী হিসাবেও না। ফলে দলীলটি আমাদের স্বাধীনতার দলীল না হয়ে পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পনের দলীল বলে গণ্য হয়ে আছে। দলীলে উল্লেখ আছে:

'এই দলীল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জেঃ অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ– আত্মসমর্পন চুক্তি ভঙ্গের সামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলী ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আত্মসমর্পন চুক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লেঃ জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেন যে, যারা আত্মসমর্পন করবে তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে।'

আত্মসমর্পনের এই দলীল বলে দলীল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড অন্তর্গত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, মুজাহিদ বাহিনী, আলবদর বাহিনী, পাকিস্তানের প্রতি অনুগত বাঙালি পুলিশ বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী জেঃ অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হয়ে যায়। কারণ এ সব কয়টি বাহিনীই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড অন্তর্গত পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক বাহিনী ছিল। চুক্তিতে লেঃ জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেন যে, যারা আত্মসমর্পন করবে তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। চুক্তিতে আরো বলা হয়: এই আত্মসমর্পন চুক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চুক্তির শর্ত মোতাবেক জেনারেল অরোরা জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড

www.pathagar.com

অন্তর্গত বাহিনীর যার যে সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য ছিল তা প্রদান করেন। তিনি এই বিশাল বাহিনীর মধ্য থেকে মাত্র ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করেন এবং পরে ত্রি-রাষ্ট্রীয় সমঝোতার ভিত্তিতে তাদেরও মুক্তি দেন। এখন যুদ্ধপারাধীদের বিচার করতে হলে পাক বাহিনী বা তাদের সহযোগী কোন বাহিনীর কোন সদস্যের বিচার করার কোন অধিকার এই চুক্তিতে কেন বাঙালিদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়নি অনতিবিলম্বে তা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা দরকার। যুদ্ধপারাধীদের বিচার করতে হলে এই চুক্তির পরও কিভাবে বাঙালিরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারে তার একটি আইনগত ভিত্তি অবশ্যই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

১০. যুদ্ধাপরাধী কারা? যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা কয়েকটি নির্দিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তারাই হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী। অপরাধগুলো হচ্ছে: ১) যুদ্ধের সময় সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন নারী, শিশু, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করা। ২) বেসামরিক বাড়িঘর, স্থাপনা, দোকানপাট, শস্যভান্ডার বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ। ৩) ধর্ষণ। ৪) লুটপাট।

একাত্তরে এ জাতীয় ঘটনা বিস্তর ঘটেছে। কেউ না কেউ এসব ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। যিনি বা যারাই এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল তারা সবাই যুদ্ধাপরাধী। যুদ্ধে বিজিত বা বিজয়ী যে পক্ষই এসব অপরাধ করুক না কেন কোন পক্ষই তার দায় এড়াতে পারে না। পরাজিত হলেই অনুকম্পাবশতঃ এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমা করতে হবে এমন দাবী করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি বিজয়ী হলেই কাউকে এ জাতীয় অপরাধের অবাধ লাইসেন্স দিতে হবে এমন দাবীও যৌক্তিক নয়। অপরাধ অপরাধই– তা যিনি বা যারাই করুক না কেন। সন্ত্রাসীর যেমন কোন দল নেই তেমনি অপরাধীরও কোন পক্ষ নেই। এই চিরাচরিত নীতির ভিত্তিতেই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত ও সনাক্ত করতে হবে।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ২৫ মার্চের আগেই ঢাকাসহ সারাদেশে প্রচুর বিহারীদের হত্যা করা হয়। সবচে বেশী হত্যাকান্ড সংগঠিত হয় ঢাকা, রংপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট করা হয়। মিরপুর ও মোহাম্মদপুর বলতে গেলে পুরোটাই ছিল তখন বিহারী অধ্যুষিত। সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। সে সময় এ নির্বিচার হত্যাকান্ডের হাত থেকে যারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল এখনো তারা মুহাম্মদপুরের বিহারী ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তারা তাদের বাড়িঘরে আর কোনদিনই ফিরে যেতে পারেনি।

এরপর ২৫ মার্চ রাতে পাক আর্মি সারা ঢাকা শহরে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। তারপর থেকে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা নির্মূলের অজুহাত তুলে সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়।

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধারা পাক আর্মির ওপর যেখানেই গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছে সেখানেই পাক আর্মি প্রতিশোধবশতঃ আশপাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা করেছে।

১৯৭১ সালের আগস্ট পর্যন্ত পাক আর্মির এসব অপারেশনে রাজাকার বা আলবদর বাহিনীর কোন ভূমিকা ছিল না। কেবলমাত্র পুলিশ বাহিনী ছিল তাদের সহযোগী। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী গঠিত হলে (সূত্র: দ্যা বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান: জেনারেল এ এ কে নিয়াজী) তারা পুলিশের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট, সেতু পাহারা দেয়াসহ পাক সরকারের সহযোগী হিসাবে নিজেদের নাম অন্তর্ভূক্ত করে। ইতোমধ্যে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করায় এবং তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাক বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর ফলে পাক বাহিনীর অবাধ বিচরণ সঙ্কুচিত ও সীমিত হয়ে পড়ে। একতরফা হত্যাকান্ড বন্ধ হয়ে যায়। পাক বাহিনীর হত্যাকান্ডের বদলা হিসাবে মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশের গ্রামগঞ্জে শান্তি কমিটির সদস্য ও দালালদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে শুরু হরে।

এ সময় সবচে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে রাজাকাররা। আত্মরক্ষার আশায় যে পাক আর্মির তারা সহযোগী হয়েছে তারা থাকে ক্যাম্পে আর মুক্তিবাহিনীর টার্গেট হওয়ার জন্য রাজাকারদের রেখে দেয় দিনভর রাতভর ব্রিজ-কালভার্ট পাহারায়। যুদ্ধের এ পর্যায়ে এসে কিছু সপক্ষ ত্যাগের ঘটনা ঘটে। মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেলে রাজাকারদের কেউ কেউ অস্ত্রসহ পালিয়ে গিয়ে যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীতে। ফলে রাজাকারদের ওপর শানিত হয় পাক বাহিনীর সন্দেহের দৃষ্টি। সন্দেহ হলেই তার ওপর টার্গেট প্রাকটিস করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ এগিয়ে যায় এবং ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রোশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পাক হানাদার বাহিনীকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয় ইন্ডিয়ান আর্মি। তাদের গায়ে আঁচড়টি কাটারও সুযোগ না পেয়ে সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশ গিয়ে আছড়ে পড়ে পাক বাহিনীর দালাল রাজাকার, আলবদর ও শান্তি কমিটির ওপর। আক্রোশের শিকার বিপুল সংখ্যক রাজাকার ও পাকিস্তানি দালাল নিহত হয়। নিহত হয় তাদের ছেলে-সন্তান, স্ত্রী-কন্যা। তাদের বাড়িঘর লুট হয়। যারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয় তারাও জানের মায়ায় ত্যাগ করে বাড়িঘর, সহায় সম্পদ। কেউ বন্দীত্ব কবুল করে জান বাঁচায়। তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের ওপর নেমে আসে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও বিপদের ঝড়। Harvard Univercity-এর গবেষণা মতে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে

www.pathagar.com

দুইলক্ষ লোক নিহত হয় তার বড় অংশ ছিল বিহারী ও আলবদর-রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং শান্তি কমিটির লোক।

১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর পরাজিত রাজাকার আলবদরদের পল্টন ময়দানে জড়ো করে কাদের সিদ্দিকী যেভাবে তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছিলেন তা দেখে শিউরে উঠেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সাংবাদিক উরিয়ানা ফালাচি। এ নিয়ে তার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে কথা কাটাকাটি হয় এবং তিনি এই বর্বরতার প্রতিবাদে আর কোনদিন এ দেশে আসবেন না বলে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

একাত্তরে এভাবে নানা পর্যায়ে নানা ভাবে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়ে। এসব যুদ্ধপরাধ যারা সংগঠিত করেছে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণসহ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হলে আদালতই নির্ধারণ করবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আসলেই যুদ্ধাপরাধী কি না, আর এভাবেই প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হতে পারে।

১১. একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকেই। জামায়াত যেহেতু ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে জন্য আওয়ামী লীগের সাথে তার স্বাভাবিক মতপার্থক্য ও দূরত্ব ছিল। পাকিস্তানের জন্ম থেকেই ভারত পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। নিয়মিত সীমান্ত সংঘাত এবং ৬৫-এর যুদ্ধ ছাড়াও চব্বিশ বছরে ৭টি বড় ধরনের পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জনশ্রুতি ছিল যে, ভারত সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে সেই ষড়যন্ত্রের অংশ বলে দাবী করে পাক সরকার শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে এবং পরে গণআন্দোলনের মুখে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। (মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ নেতারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সঠিক ছিল বলে দাবী করেন।)

এরপর সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানের সবকয়টি ইসলামী দল গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানায়। এ দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করায় আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ইসলামী দলগুলো যেহেতু আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাচ্ছিল তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এ অসহযোগ আন্দোলনে ইসলামী দলগুলো একাত্ম হতে পারতো এবং এ আন্দোলনই যেহেতু অত্যল্পকাল পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে পর্যবসিত হয় তখন তারা স্বাধীন তা আন্দোলনেও শামিল হতে পারতো। কিন্তু কথিত আছে, ভারত ইসলামপন্থীদের নিয়ে বৃহত্তর মোর্চা গঠনের বিরোধিতা করায় আওয়ামী লীগ কোন ইসলামী দলকেই তাদের সঙ্গে নিতে রাজি হয়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিহারী নিধনের যে ঘটনা ঘটে তাও ভারতের ইন্ধনে ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। টার্গেট ছিল, কোন মতেই যেন ইয়াহিয়া ও

www.pathagar.com

মুজিব একটি সমঝোতায় পৌঁছতে না পারে এবং উভয় পক্ষের বিরোধ যেন আরো মারমুখী হয়। ঘটেও ছিল তাই। বিহারী নিধনের প্রতিশোধ নিতে ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী গণহত্যা চালায় এবং বাংলার মানুষ এই হত্যাকান্ডের ফলে বাধ্য হয় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে।

তাই ভারতের সহায়তা নিয়ে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে শরীক হতে জামায়াতের নীতিগত আপত্তি ছিল এবং জামায়াত মনে করতো পাঁচকোটি পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে বাঁচার জন্য চুয়ান্ন কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ভারতের অধীনতা মেনে নেয়াটা সঙ্গত হতে পারে না। তারা হাজার মাইল দূরবর্তী ৫ কোটি পাকিস্তানির খপ্পড় থেকে বেরিয়ে সীমান্ত ঘেঁষা ৫৪ কোটির খপ্পড়ে পড়াকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতো। এসব কারণে শুরু থেকেই জামায়াত স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। দিন যত যেতে লাগলো জামায়াত দেখলো তাদের আশঙ্কাই কেবল সত্যে পরিণত হচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শরীক বামপন্থীরা গুপ্তহত্যা ও নজরবন্দীর শিকার হচ্ছে। মাওলানা ভসানী, কাজী জাফরসহ অনেক বাম নেতা কোলকাতায় নজরবন্দী হয়ে পড়েছেন। গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছেন অনেক আলেম-ওলামা। এভাবেই একদিন গুপ্তহত্যার শিকার হলেন আওলাদে রাসূল মোস্তফা আল মাদানীর মত বিশ্ববিখ্যাত বুজুর্গানে দ্বীন। জামায়াতের মধ্যে এই ভয় কাজ করতে শুরু করল যে, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসাবে আওয়ামী লীগ হয়তো জামায়াতের সাথে আরো খারাপ আচরণ করবে। ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের অধীনতা চুক্তি এই ভয় ও আশঙ্কাকে আরো দৃঢ় করল।

ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের গোপন অধীনতা চুক্তি

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পর অক্টোবরে ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এই চুক্তিসম্পাদিত হয়। চুক্তিতে বলা হয়:
'মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি এমন সব প্রশাসনিক কর্তকর্তাকে চাকরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় কর্মকর্তাগণ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যতদিন ইচ্ছা ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে থাকবে এবং প্রতি বছর নভেম্বরে তা নবায়ন করা হবে।
বাংলাদেশের কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধে অধিনায়ক থাকবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন। যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের অধিনায়কত্বে নয়। বাণিজ্য চলবে ওপেন মার্কেট সিস্টেমে, কোন বর্ডার থাকবে না। আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করবে ভারত।'
(*সূত্র:* দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা)।

www.pathagar.com

কোন সুস্থমস্তিকের অধিকারী স্বাধীন মানুষ কখনোই এমন দাসখত দিতে পারে না। 'দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা' নামক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর পরই মুর্ছা যান।'

এতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন নয় বরং একজন বন্দীর কাছ থেকে যেভাবে ভয়ভীতি ও অস্ত্রের মুখে নানা রকম স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় সেভাবেই এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। এসব নানা কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ইসলামপন্থীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানে ইসলাম কায়েম না হলেও ইসলাম কায়েমের পথ সহজ হতে পারে বিবেচনা করে জামায়াত দেশপ্রেমিক দল হিসাবে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষাবলম্বন করে। রাজনৈতিক দল হিসাবে জামায়াতের তৎপরতা রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক ভিন্নমত প্রকাশের অবকাশ নিঃশেষ হয়ে যায়। 'পূর্ব পাকিস্তান' নামক ভূখন্ডটি ১৬ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াত সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে মেনে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে ১৬ ডিসেম্বরের আগে জামায়াত যে দেশে বসবাস করেছে সেই দেশের প্রতি অনুগত থেকে দেশপ্রেমিকের স্বাক্ষর রেখেছে এবং একইভাবে ১৬ ডিসেম্বরের পর নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তার দেশপ্রেমেরই অনন্য নজীর স্থাপন করেছে।

শেখ মুজিব জামায়াতের বিশাল জনশক্তিকে দেশগড়ার কাজে সুযোগ দেয়ার জন্য হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মত অপরাধে জড়িতদের বাদে শুধু রাজনৈতিক মপার্থক্যের কারণে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত হতে পারেনি তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবের প্রজ্ঞা এবং জামায়াতের সিদ্ধান্ত ছিল ভাবাবেগ বর্জিত এবং বাস্তবসম্মত। জামায়াত যে যুদ্ধাপরাধী ছিল না এটা নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন বলেই জাতিরজনক শেখ মুজিব জাতির বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলা জাতির পিতার প্রজ্ঞাকে হেয়, অবজ্ঞা ও অপমান করারই নামান্তর।

১২. একাত্তরের ২৬ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী অতর্কিতে এবং নির্বিচারে বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। এ ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যেমন নিরূপায় হয়ে সামনে বাড়ে; সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় বাঙালিও তেমনি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়তে বাধ্য হয়েছিল। এই দুর্দিনে এমনও দেখা গেছে, এক ভাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে আরেক ভাই বাপ-মা ও ঘর-বাড়ি বাঁচাতে গিয়ে যোগ দিয়েছে রাজাকার বাহিনীতে। মা নফল নামাজ পড়ে দু'সন্তানের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহর দরবারে আকুল হয়ে দু'হাত তুলে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন।

কখনো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঠিক অবস্থান ও অবস্থা জানার জন্য মুক্তিবাহিনী পরিকল্পিতভাবেই রাজাকার বাহিনীতে লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে। পরে তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী করেছে সফল অপারেশন। কেউ কেউ রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। খেটে খাওয়া অনেক গরীব মানুষ পেটের দায়ে রাজাকারের চাকরী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

পাকবাহিনীর জানা ছিল না কে মুক্তিবাহিনী আর কে সাধারণ নাগরিক। ফলে তারা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করেছিল। এ সময় কয়েক লাখ শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিলেও সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বাকি সবাই তখন দেশেই অবস্থান করছিল। শিশু-নারী-বৃদ্ধসহ এই অসহায় মানুষদের পক্ষে ভারতে পাড়ি জমানো সম্ভব ছিল না। এই গণহত্যার সয়লাব রোধ করার জন্যও কেউ কেউ রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করেছিল।

পাক বাহিনী শান্তিকমিটির মাধ্যমে দেশের অনুগত নাগরিকদের জন্য 'ডান্ডিকার্ড' চালু করেছিল। এই 'ডান্ডিকার্ড' না দেখিয়ে কারো পক্ষে আর্মিদের সামনে দিয়ে চলাচল সম্ভব ছিল না; বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় তো কারো পক্ষে প্রবেশ করাই ছিল অসম্ভব। সে সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধাই 'ডান্ডিকার্ড' নিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করেছে। এই 'ডান্ডিকার্ড' মুক্তিযোদ্ধাদের কারা সরবরাহ করেছিল? নিশ্চয়ই রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকেরা।

এ রকম নানা কারণে রাজাকার বাহিনীতে যোগদানকারী সবাই যে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনকর্মে জড়িত ছিল এমনও নয়। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধেই আনা সম্ভব যারা এ ধরনের অপরাধকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাই সব রাজাকার যে যুদ্ধাপরাধী এমন উক্তিও সঙ্গত নয়।

১৩. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুজাহিদের 'দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই' এই সত্য ভাষণকে কেন্দ্র করে তথাকথিত রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ ও একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যেভাবে মাঠ গরম করছেন তাতে এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি এ মন্তব্য না করলে তারা চুপ করে বসে থাকতেন। কারণ আমরা দেখেছি, মুজাহিদের আগে নির্বাচন কমিশনের সাথে যেসব রাজনৈতিক দল সংলাপে বসেছিল তাদের অনেকেই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী উত্থাপন করেছিল। মুজাহিদের বক্তব্যই যদি তাদের

www.pathagar.com

উত্তেজনার কারণ তবে মুজাহিদের এ বক্তব্য প্রদানের আগে কেন তারা জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী করেছিলেন? ফলে, এটি যে একটি বাহানামাত্র তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কা নয়। বরং বর্তমান সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য তারা ক্রমাগতভাবে যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এটা তারই অংশমাত্র। দেশকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্য জোট সরকারের আমল থেকেই তারা এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত। সাংবিধানিকভাবে দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করার মধ্য দিয়ে তারা প্রাথমিক বিজয় অর্জন করেছিল। প্রকাশ্য রাজপথে লাশের ওপর নৃত্য করে তারা সেই বিজয় উৎসবও উদযাপন করেছে।

এরপর যে অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হন তাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট, প্রথম আলোতে মহানবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ ও সাপ্তাহিক ২০০০-এ কাবাকে বাইজি পাড়ার সাথে তুলনা করার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের উস্কে দিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে মুখোমুখি করার প্রয়াস এবং ৩৬ বছর পর নতুন করে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবীতে মাঠ সরগরম, সবই একসূত্রে গাথা। উদ্দেশ্য, দেশে একটি অস্বাভাবিক ও অস্থিতিশীল পরিবেশ জিইয়ে রেখে সরকার যে নির্বাচনের রোডম্যাপ দিয়েছে তাকে ভন্ডুল করা।

এইসব তথাকথিত রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতার কারণেই দেশে আজ বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ; অর্থনীতি স্থবির, গণতন্ত্র গৃহবন্দী, দ্রব্যমূল্য লাগামহীন।

অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতা নেয়ার সুবাদে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের বুদ্ধি বিক্রির বড় ধরণের খরিদ্দার পেয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে। বিদেশী দূতাবাসগুলো এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে মিডিয়ায় তারা প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় অনবরত কোরাস গাইতে শুরু করেছে। এ কাজে সন্তোষজনক মাসোহারা ছাড়াও আছে লোভনীয় নানা পুরস্কার। দেশকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিল সিডিপি। তারাই বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার নামে কুটতর্কের মাধ্যমে নানা তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তুলেছিল।

তাদের যখন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার কথা বলা হতো তখন তারা বলতো, জনগণের জন্য সংবিধান– সংবিধানের জন্য জনগণ নয়। শুনতে খুবই ভাল লাগতো তাদের কথা। এভাবে যখন নির্বাচন ভন্ডুল করা সম্ভব হলো তখন

www.pathagar.com

অনির্বাচিত সরকার এসে সিডিপির প্রধান নির্বাহী দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দিল দেশকে অস্থিতিশীল করার পুরস্কার হিসাবে। এভাবে আরো অনেকেই পুরস্কৃত হয়েছেন।

সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা এতে উল্লসিত। তারা দেশকে যত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারবেন ততই তাদের জন্য এভাবে বরাদ্দ হবে আরো পুরস্কারের ডালি। এই আশাতেই ৩৬ বছর পর যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবীতে তারা সোচ্চার হয়েছেন। এতে তারা অন্তত আশু দুটি ফল পেতে চাচ্ছেন। প্রথমটি হচ্ছে সরকার যে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন তাকে বাঁধাগ্রস্ত করা; যাতে সরকার ঘোষিত সময়ে এ দেশে কিছুতেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারে। এভাবে তারা অনির্বাচিত সরকারের মেয়াদ বাড়িয়ে দেশকে আরো দীর্ঘদিন গণতন্ত্রহীন অবস্থায় রাখতে চান।

দ্বিতীয় যে ফায়দাটি তারা পেতে চান তা হচ্ছে, যদি নির্বাচন হয়েই যায় তবে যেন জামায়াত থাকে জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। তাদের ভয়ের কারণ হচ্ছে, দেশে যেভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হয়েছে তাতে দেশের দুই প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই অভিযুক্ত হওয়ায় এবং গত টার্মে সরকারে থাকার পরও জামায়াত নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জামায়াতের আমীর ও সেক্রেটারী জেনারেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ এখনো পর্যন্ত উত্থাপিত না হওয়ায় জনগণ এবার জামায়াতের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। যাতে জামায়াতের পক্ষে এরকম কোন গণজোয়ার সৃষ্টি হতে না পারে তার জন্যই জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী বানানোর এই প্রাণান্তকর প্রয়াস।

এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে দেশ যেন আর উঠে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য তারা যে আগামী দিনগুলোতেও সমান সক্রিয় থাকবে না তার কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। এদের সুবিধা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন থেকে কঠিনতর হলেও তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। বরং তারা যত দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারবে ততই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর হবে। টিভির টকশোতে তাদের চেহারা আরো প্রফুল্ল হবে। আমাদের পাটকল বন্ধ হলে, গার্মেন্টস শিল্প মুখ থুবড়ে পড়লে তাদের বিদেশী প্রভু আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বুদ্ধি আরো অধিক মূল্যে কিনতে আগ্রহী হবে। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের কি হবে সেটা ভাবার দায়িত্ব যেহেতু তাদের নয়, সেটা বরং আমাদেরই ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা বিরোধী ও ধর্মীয় রাজনীতি প্রসঙ্গ

১. 'এ দেশে কোন স্বাধীনতা বিরোধী নেই এবং ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী সংবিধান বিরোধী' বলে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে কেউ কেউ নাখোশ হয়েছেন। এই নাখোশ ব্যক্তিরা ৩৬ বছর আগের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরীর মাধ্যমে আগামী নির্বাচন ভন্ডুলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমরা সবাই জানি, ৭১-এর ২৬ মার্চ পাকবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়াই রাজারবাগের পুলিশ ও পিলখানার তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সৈন্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়ে এবং পরে ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ডাক দিলে শুরু হয়ে যায় আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা সংগ্রাম। এরই সূত্র ধরে দীর্ঘ নয় মাস পর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় এবং পাকবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। এই আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে এই ভূখন্ডে ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনের এবং পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন একটি রাষ্ট্রের; যার নাম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৬ ডিসেম্বরের আগে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি বরং ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ অঞ্চল ছিল পাকিস্তানের অংশ এবং তার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর এই ৯টি মাস এ দেশের মানুষ পার করেছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমনে দিশেহারা হয়ে কয়েক লাখ লোক পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিলেও দেশের বাদবাকী সব লোক, যার সংখ্যা তখনো সাত কোটির ওপর; সবাই দেশেই থাকতে বাধ্য হয়।

বাঙালিদের মধ্যে কে মিত্র আর কে শত্রু তা চিহ্নিত করা উর্দুভাষী এই পাকবাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে তাদের চোখে তখন বাঙালি মাত্রই শত্রু। এই শত্রু নিধনে পাকবাহিনী ২৬ মার্চ থেকেই নির্বিচার গণহত্যা শুরু করল। শেখ মুজিবের নির্দেশে আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে পালিয়ে গেলেন। অত্যাধুনিক অস্ত্র আর প্রশিক্ষিত পাকবাহিনীর তোপের মুখে তখন এ দেশের অধিকাংশ নিরস্ত্র ও অসহায় সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ। এই অভাবিত ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত, শিহরিত ও মর্মাহত।

এই নির্বিচার গণহত্যা রোধ করাই তখন ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। তারা দেশের নিরীহ ও অসহায় এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। মুসলিম লীগের কয়েক গ্রুপ, নেজামে ইসলামী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি পিডিপিসহ পাকিস্তানের ইসলামপন্থী সবকটি রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানের শাসক ও সামরিকজান্তাদের বুঝানোর চেষ্টা করল: এ দেশের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান এবং তারা সবাই ইসলামপ্রিয়। যে আওয়ামী লীগের সাথে তোমাদের বিরোধ সে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মীই ভারতে পালিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের সাথে তোমাদের যে বিরোধ সে বিরোধের সুরাহা নির্বিচার গণহত্যার মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। অতএব তোমরা এ গণহত্যা বন্ধ করো। এই প্রচেষ্টার ফলেই পাকবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা বন্ধ হয়। এরপর তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ লড়াই দীর্ঘ নয় মাস চলার পর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় এবং পাক সামরিক জান্তা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যেহেতু ১৬ ডিসেম্বরের আগে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে কোন রাষ্ট্র ছিল না অতএব ১৬ ডিসেম্বরের আগে এর অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার করায় কিছু যায় আসে না। যে শিশুর জন্মই হয়নি শত বার স্বীকার করলেও তা অস্তিত্বহীন। কিন্তু জন্মের পর কাউকে অস্বীকার করা অপরাধ এবং সত্যের অপলাপ। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামক এই ভূখন্ডটি পাকিস্তানের অংশ থাকবে নাকি বাংলাদেশ হবে এই বিতর্কের ইতি ঘটলো। যদি কেউ এরপর বাংলাদেশকে অস্বীকার করে বা এই বিতর্ককে জিইয়ে রাখতে চায় তাহলে তাকে সত্য অস্বীকারকারী বলা চলে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী আছে কি নেই তা খুঁজতে হবে বাংলাদেশের জন্মের এই ইতিহাসকে সামনে রেখে।

১৬ ডিসেম্বরের পর কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করলে সে অবশ্যই স্বাধীনতা বিরোধী। প্রশ্ন হচ্ছে, জামায়াত ১৬ই ডিসেম্বর পর কখনো স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে কিনা? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জামায়াতের কাজকর্ম, তাদের বক্তব্য-বিবৃতি, তাদের কোন সমাবেশের উচ্চারণ থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা, যা স্বাধীনতা বিরোধিতার পর্যায়ে পড়ে? যদি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে অবশ্যই জামায়াত স্বাধীনতা বিরোধী। আর যদি পাওয়া না যায় তাহলে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী বলার কোন যুক্তি থাকে না। যেহেতু

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামায়াত এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে এবং বিগত ৩৬ বছর ধরে এ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিতে বিপুল পরিমাণ অবদান রেখে প্রমাণ করেছে তারা স্বাধীনতা বিরোধী নয়; তাই কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল হিসাবে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী বলা অন্যায়। ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে অদ্যাবধি জামায়াতের কাজকর্ম, তাদের বক্তব্য-বিবৃতি, তাদের সভা-সমাবেশের উচ্চারণ থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যাতে তাদের স্বাধীনতা বিরোধী বলে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী বলার কোন অবকাশ থাকে না।

জামায়াতে ইসলামী নিজে স্বাধীনতার পর কাউকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেনি। অতএব জামায়াত যে কাউকে স্বাধীনতা বিরোধী মনে করে না তা পরিষ্কার। অন্যদিকে জামায়াতও যেহেতু স্বাধীনতা বিরোধিতায় লিপ্ত নয় তাই জামায়াত নেতা সহজেই বলতে পারেন 'দেশে কোন স্বাধীনতা বিরোধী নেই'।
বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার আগের এবং পরের জামায়াতের ইতিহাস জানে। জামায়াত কোন গোপন সংগঠন নয়; এর যা কার্যক্রম তা সবই প্রকাশ্যে জনগণের চোখের সামনেই সংগঠিত হয়। ফলে এ দেশে জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর থেকে জামায়াতের প্রতি জনগণের সমর্থন বাড়া বৈ কমেনি। এ দেশের জনগণ বোকা নয়। রাজনীতিবিদদের যে কোন কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যোগ্যতা এ দেশের জনগণ রাখে। হাল আমলের জঙ্গীবাদের সাথে জামায়াতের সম্পৃক্ততার প্রচারণা যেমন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ,৭১ সালের জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে যে প্রচারণা তাও যে তেমনি বিরোধীদের অপপ্রচারমাত্র এ দেশের জনগণ তা বিশ্বাস করে। আর তা করে বলেই এইসব নিন্দুকের কথায় জনগণ কোনদিনই কান দেয়নি।

এ জন্যই জনগণ জামায়াতকে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে পাঠিয়েছে, মন্ত্রীত্ব দিয়েছে। গণ রায়ের প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল নয় কেবল তাদের পক্ষেই জামায়াতের বিরোধীতা করা সম্ভব। এ বিরোধিতার কারণে যারা জামায়াতের নিন্দায় মুখর তারা ক্রমেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। আর যত তারা গণবিচ্ছিন্ন হচ্ছেন ততই তাদের নিন্দার ভাষা কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে। তাদের চিৎকার আর্তচিৎকারে পরিণত হচ্ছে। যারা এরূপ নিন্দা করছেন তাদের কাছে অনুরোধ, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে জামায়াত স্বাধীনতা বিরোধী কিনা সেই বিচারের ভার জনগণের ওপর ছেড়ে দিন। জনগণই ঠিক করুক কে স্বাধীনতা বিরোধী আর কে নয়।

যে সংবিধানের শুরু হয়েছে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এবং যে

www.pathagar.com

সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছে সে সংবিধানের আওতায় ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তোলার কোন অবকাশ নেই। এমন দাবী সংবিধান বিরোধীতারই নামান্তর। যারা এমন দাবী তোলছেন সংবিধান লংঘনের দায়ে তাদের বিচার হওয়া উচিত। অতএব জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুজাহিদ 'ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী সংবিধান বিরোধী' বলে যে সত্য উচ্চারণ করেছেন তাতে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই।

একটি টিভি টকশোতে জনাব শাহরিয়ার কবির জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নও নাকি তাদের এ দাবীর সাথে একমত। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'ঠাকুর ঘরে কে রে; আমি কলা খাই না।' আমরা না বললেও জনগণের মনে প্রশ্ন জেগেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থানুকুল্যে ইসলাম বিরোধীতার এটা কি তবে নতুন কোন মিশন? অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশেই যে 'খ্রীস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি' দাপটের সাথে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেটা কি তাদের চোখে পড়ে না? অথবা যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আদর্শে তারা আমাদের দীক্ষা দেয়ার জন্য চেষ্টা করেন সেই ভারতে 'বিজেপি'র মত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কি বলে না ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী আধুনিক এ বিশ্বে এখন অচল দাবী? ধর্মীয় রাজনীতি কেবল বাংলাদেশে নয়; বিশ্বের বহু দেশেই চালু আছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর বাইরে নয় বলেই সভ্য পৃথিবীর মত এ দেশেও ধর্মীয় রাজনীতির কল্যাণকর ধারা বিকাশমান। খ্রীস্টান প্রধান দেশে খ্রীস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি' থাকতে পারলে, হিন্দু প্রধান দেশে বিজেপির মত হিন্দুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল থাকতে পারলে মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামী রাজনীতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রবাহ যারা বন্ধ করতে চায় তারা কেবল ধর্মের শত্রু নয়, গণতন্ত্রেরও শত্রু।

বাম রাজনীতিবিদরা অনেক দিন ধরেই এ দাবী করে আসছেন কিন্তু তাদের দাবী বিশ্ব সম্প্রদায় অতীতে যেমন কানে তোলেননি তেমনি আজকেও খুব কমই কানে তুলেছেন। ভারত বিভাগের পর মহাত্মা গান্ধীর কাছে যখন ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তোলা হয়েছিল তখন তিনি হেসে বলেছিলেন:

'যারা ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তোলে তারা ধর্মও বুঝে না, রাজনীতিও বুঝে না।'

কিন্তু সেই অবুঝরা তখনো ছিল; এখনো আছে। বাস্তবতাবর্জিত এ ধরনের আবদারে কান দেয়া কোন বুদ্ধিমানেরই কর্ম নয়। ধর্ম মানুষকে শেখায় সততা, প্রেম, মনুষত্ব ও মহানুভবতা। অতএব ধর্মীয় রাজনীতির বিরোধিতা কেবল আমাদের সংবিধান বিরোধীই নয়; এ দাবী গণতন্ত্র বিরোধী, ধর্ম বিরোধী, মানবতা এবং মনুষত্ব বিরোধীও।

www.pathagar.com

একাত্তরের রাজনীতি

মিডিয়ায় এখন একাত্তর প্রসঙ্গ তুঙ্গে। সে সময় কোন দলের কি ভূমিকা ছিল তাই নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ। তবে একাত্তরের রাজনৈতিক পটভূমি তুলে ধরার চাইতে একপেশে আলোচনা হচ্ছে বেশি। সে সময় মুক্তিযুদ্ধে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে চলছে তুখোড় আলোচনা। এসব আলোচনার বেশির ভাগই হচ্ছে জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা করার মতলব নিয়ে। ফলে যেসব তথ্য দিলে জামায়াত বেকায়দায় পড়বে সে সব তথ্যই উঠে আসছে আলোচনায়। কিন্তু কেউ এ কথা বলছেন না, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৩% ভোট পেয়েও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে পরাজিত দলগুলোর মধ্যে জামায়াতই সর্বপ্রথম বিবৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং তৎকালীন জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তানের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছিল। তার এ বিবৃতি সে সময় পাকিস্তানের সকল সংবাদপত্রে গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি বায়তুল মোকাররমের সামনে জনসভা করেও একই দাবী উত্থাপন করেছিলেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যদি পাকিস্তান সরকার জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে তবে পাকিস্তানের অখন্ডতা বিঘ্নিত হতে পারে।

একটি গণতান্ত্রিক দল হিসাবে জামায়াত সব সময়ই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। জামায়াত তখনো মনে করতো এবং এখনো মনে করে জনগণ যাদের পছন্দ করবে দেশ চালানোর অধিকার তাদেরই। এ জন্যই পাকিস্তানের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। চুয়ান্ন সালের নির্বাচন, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) বা কপের রাজনৈতিক মোর্চায় জামায়াত যে ভূমিকা রেখেছিল তাতে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যথেষ্ট বেগবান ও শক্তিশালী হতে পেরেছিল। সত্তরের নির্বাচনে জামায়াত পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিকভাবে জামায়াতকেই তখন প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে হতো। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবুর রহমান এবং জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম কেউই চাননি পাকিস্তানটি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যাক। কেবল আওয়ামী লীগ বা জামায়াত নয়, নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপসহ কোন ইসলামী দলই চায়নি পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক। কিন্তু বাদ সাধলেন পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো।

পূর্ব পাকিস্তানে যেমন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ভুট্টোর পিপলস পার্টি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তার আর ক্ষমতায় যাওয়া হয়ে উঠে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের কোন প্রভাব নেই পশ্চিম পাকিস্তানে আবার পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টির কোন প্রভাব নেই পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু উভয় পাকিস্তানেই সম্ভাবনাময় দল জামায়াতে ইসলামী। ফলে জামায়াত চাচ্ছিল দেশটি টিকে থাক; যাতে আঞ্চলিক দলগুলোর প্রভাব কখনো ক্ষুন্ন হলে দেশব্যাপী বৃহৎ দল হিসাবে জামায়াত সামনে আসতে পারে।

অপর দিকে আওয়ামী লীগ, বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের অখন্ডতা চাচ্ছিলেন এ জন্য যে, আঞ্চলিক দল হলেও তারা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব তিনি যদি সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তবে বাঙালিদের ওপর এতদিন যে শোষণ নিপীড়ন চালানো হয়েছে তার কিছুটা প্রতিকার হয়তো করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাতে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ চিরতরে রহিত হয়ে যায় পিপলস পার্টির। ফলে ভুট্টো পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়াকে বুঝালো, যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পায় তবে ২৪ বছরের শোষণের শোধ তারা একবারেই তুলে নেবে। তাই এমন কোন উপায় বের করুন, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার মুজিবের হাতে থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা থাকে আমার হাতে। এই নিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে একান্তে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়; যে খবর সবাই জানেন।

সামরিক শাসকের কাছে গণতন্ত্র থাকে সব সময়ই মূল্যহীন। ভুট্টোর প্ররোচনায় শঙ্কিত পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দিতে গড়িমসি শুরু করলেন। একমাত্র ভুট্টো ছাড়া পাকিস্তানের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান

www.pathagar.com

তার কোন তোয়াক্কাই করলেন না। তিনি ভুট্টোর ফাঁদে পা দিয়ে কি করে ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা করা যায় সে চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন। ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বুঝাতে সক্ষম হলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোন ভিত্তি নেই তাই মুজিবের হাতে ক্ষমতা দিলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে ফেলবেন। তাতে পাকিস্তানের অখন্ডতা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আওয়ামী লীগের কারণে যদি কোন রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে এর জন্য দায়ী হবেন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান। রাষ্ট্রের এই অখন্ডতা বিনষ্টের দায় যদি তিনি এড়াতে চান তাহলে তার একমাত্র পথ ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ। এ সমস্যা থেকে দেশকে বাঁচানোর উপায় ইয়াহিয়া খানকেই উদ্ভাবন করতে হবে।

ভুট্টো ইয়াহিয়া খানকে এও জানিয়ে দিলেন, তিনি কিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মেনে নেবেন না। ফলে স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে তৈরী হলো বিরাট প্রতিবন্ধকতা। ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের মনে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা নষ্টের যে ভয় ঢুকিয়ে দিল সে ভয় থেকে যেমন বেরিয়ে আসতে পারলেন না ইয়াহিয়া খান তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন উপায়ও বের করতে পারলেন না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষেও ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের কোন প্রস্তাব মেনে নেয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে যায় প্রায় দু মাস। পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে তখন ঘন কালো মেঘের ছায়া।

এ বিষয়ে কি করে একটি সমঝোতায় আসা যায় এ নিয়ে আলাপ করার জন্য ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তাকে পশ্চিম পাকিস্তান যেতে বাধা দিল তারই দলের প্রভাবশালী একটা অংশ। তিনি ইয়াহিয়া খানকে সাফ জানিয়ে দিলেন, এ আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতে পারছেন না। দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান নিজেই এবার পাকিস্তান থেকে ঢাকায় এলেন। শুরু হলো মুজিব-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠক। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী দলগুলো আবারও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পাক সামরিক শাসককে চাপ দিল, কিন্তু তাতে কাজ হলো না কোন।

কয়েকদিন ধরে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছিল তা জনগণের পক্ষে জানা কোনদিনই সম্ভব হয়নি। তবে পঁচিশে মার্চের আগ পর্যন্ত প্রতিদিনই আলোচনা শেষে উভয় পক্ষ থেকেই বলা হচ্ছিল, আলোচনা ফলপ্রসুভাবে এগুচ্ছে। কিন্তু আলোচনা যে ফলপ্রসু হয়নি তা সবাই জানেন। ইয়াহিয়া মুজিবকে ক্ষমতা

www.pathagar.com

ভাগাভাগির অন্যায় দাবীতে যেমন রাজি করাতে পারেননি তেমনি মুজিবও ইয়াহিয়াকে শঙ্কামুক্ত করতে পারেননি যে, তার হাতে ক্ষমতা এলে পাকিস্তানের অখন্ডতা বিনষ্ট হবে না। অবশেষে ২৫ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ভেঙ্গে গেলে পাকিস্তানের ভাঙন অবধারিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কে নেবে পাকিস্তান ভাঙার দায়? পরিস্থিতি এমন নাজুক হয়ে উঠলো যে, মুজিব বা ইয়াহিয়া এর যে কোন একজনকে এই দায় কাঁধে নিতেই হবে।

মুজিব যদি তখন স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন তবে দায়টা এসে পড়তো মুজিবের ঘাড়ে। যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য একদিন তিনি লড়াই করেছিলেন বৃটিশের বিরুদ্ধে, সেই পাকিস্তান ভাঙার দায় কিছুতেই তিনি নিজের কাঁধে নিতে চাননি। ফলে সবকিছু বুঝার পরও এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য সারা দেশ থেকে প্রচন্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সম্মত হলেন না। এটা ছিল তাঁর জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণ। আলোচনার এক ফাঁকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তিনি বলেই ফেললেন:

'আপনার প্রস্তাব মেনে নিলে ছাত্ররা আমাকে মেরে ফেলবে আর ছাত্রদের দাবী মেনে নিলে আপনি আমাকে গুলি করবেন। এখন আপনিই বলুন আমি কি করতে পারি?' (দ্যা বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান: জেনারেল এ এ কে নিয়াজী)।

এরপর এলো ২৫ মার্চ। ২৫ মার্চ রাতেও তিনি পাকিস্তানের অখন্ডতার স্বপক্ষে রইলেন এই আশায় যে, সামান্য কিছু রক্তপাতের ঘটনা ঘটলেও শেষ পর্যন্ত পাক সামরিক সরকার তার হাতে ক্ষমতা না দিয়ে পারবে না। বাঙালির অনড়, অটল মনোভাব পাক সামরিক জান্তাকে বাধ্য করবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। কিন্তু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যে নিরীহ বাঙালির ওপর এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচার গণহত্যায় মেতে উঠবে এতটা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তার এ মনোভাবের পরিচয় পাই পাকিস্তানি জামাই এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বদলে শ্বশুরের দেশে অবস্থানকারী **ড. কামাল হোসেনের** জবানীতে। তিনি বলছেন:

'বঙ্গবন্ধু রাত পৌনে দশটায় আমাদের তার বাসায় দেখে বললেন, তোমরা এখনো সরে যাওনি? ... তখন আমি, তাজুদ্দিন সাহেব, আমিরুল ইসলাম একসাথে বের হলাম।' (স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা প্রসঙ্গ– পৃ: ৫২-৫৩)।

একই কথা বলেছেন তৎকালীন **ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজও**। তিনি বলেছেন:

'সেদিন রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত শেখ সাহেবের সাথে তার ধানমন্ডির বাসাতেই ছিলাম। উনি আমাদের বললেন, আজ হয়তো একটা চূড়ান্ত আঘাত আসবে।

www.pathagar.com

তোমরা এখান থেকে সরে পড়ো।' (স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা প্রসঙ্গ– পৃ: ৫২-৫৩)।

এ জন্যই তখনো পর্যন্ত শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি বরং সবাইকে সরে পড়ার এবং ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজে পাক বাহিনীর হাতে ধরা দিয়েছিলেন এই আশায়, হয়তো পাক বাহিনী বাঙালির দৃঢ়তা দেখে শেষ পর্যন্ত তার হাতে ক্ষমতা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হবেন।

উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এ রকম একটি পরিকল্পনা নিয়েই এগুচ্ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিছুতেই যে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন না, বরং পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে তিনি পাক বাহিনীর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেবেন এমন ইঙ্গিত তিনি ৭ই মার্চের ভাষণেও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো ....'।

এতেই বুঝা যায়, হুকুম তিনি দেবেন না অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার দায়িত্ব তিনি কাঁধে নেবেন না। এটি কেবল আমার কথা নয় ইতিহাস বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এমনটি মনে করেন। এমনকি আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত **ড. আহমদ শরীফও** বলেছেন:

'তিনি (মুজিবুর রহমান) ১৯৭১ সনের ২৫ ডিসেম্বর অবধি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে গেছেন। তিনি স্বাধীনতা চাননি।... বাঙালীর স্বভাব হচ্ছে হুজুগে। তাই তারা কাক শিয়ালের মত বুঝে না বুঝে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মেনে নিল।' (নয়াদিগন্ত ঈদসংখ্যা ০৭)

এতগুলো কথা এ জন্যই বললাম যে, ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এবং পূর্ব পাক জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম উভয়েই পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে ছিলেন এবং উভয়েই আশা করছিলেন, শেষ পর্যন্ত পাক সামরিক জান্তা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষেই অবস্থান নেবে। সামরিক জান্তা নির্বিচার গণহত্যায় মেতে উঠে দেশটিকে টুকরো টুকরো করার দিকে পা বাড়াবে এমনটি তখনো পর্যন্ত কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক ভাবতে পারেনি। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে সামরিক জান্তা একই সাথে শেখ মুজিবকে প্রেফতার ও গণহত্যা শুরু করলে পরিস্থিতি সকল পক্ষেরই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

এই বর্বরতায় এক অকল্পনীয় রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে পড়ে যায় পাকিস্তান নামক দেশটি। শেখ মুজিবের মত অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা যেমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে অসহায়ভাবে ধরা দেন পাক বাহিনীর হাতে তেমনি

www.pathagar.com

অসহায়ত্বের শিকার হয়ে পড়েন ইসলামী, সমাজতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদী সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও। এই অসহায়ত্বের শিকার যেমন ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তেমনি জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পিডিপি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এবং মুসলিম লীগ নেতৃবন্দও।

এর পরের ঘটনা সবাই জানেন। ২৫ মার্চ রাতে কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ও ঘোষণা ছাড়াই রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ এবং পিলখানার তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সৈন্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ডাক দিলে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছাড়াই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হয়েছিল সেই যুদ্ধে। ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত) ২৩টি দিন রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন অবস্থায় আর্মি পুলিশ ও ইপিআরের বাঙালি সৈন্যদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বাঙালি প্রাণের তাগিদে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এরপর মাত্র নয় মাস মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা ছিনিয়ে আনি আমাদের স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতা যুদ্ধে কার কি ভূমিকা ছিল, কোন দলের অবস্থান কোথায় ছিল নির্মোহ দৃষ্টিতে তা বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষের সংগঠনে থাকেই। কিন্তু আমাদের প্রবণতা হচ্ছে, যারা জিতে যায় তাদের কোন ত্রুটিই আমরা আমলে নিতে চাই না; তেমনি পরাজিতদের ভালটাও আমরা সরিয়ে রাখতে চাই দৃষ্টির আড়ালে। ইতিহাস বিশ্লেষণের এই প্রবণতা পরিহার করে সত্য উদঘাটনের দৃষ্টিতে একাত্তরের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ মিথ্যা প্রপগান্ডায় যতটা পারঙ্গম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শনে ততটাই আনাড়ি। যদি আওয়ামী লীগ একাত্তরে আরেকটু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারতো তবে পরিস্থিতি কিছুতেই এতটা খারাপ হতে পারতো না। সবাই জানেন, সত্তরের নির্বাচনের সময় এ দেশে পাঁচ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যও ছিল না। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে পাক সামরিক জান্তা হাজার মাইল দূর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য ও অস্ত্র আনা শুরু করে এবং দুই-আড়াই মাসে লক্ষাধিক পাক সেনা এ দেশে নিয়ে আসে।

আওয়ামী লীগের বুঝা উচিত ছিল, এসব সৈন্য মাছি মারার জন্য এখানে আনা হচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর তখন তেজগাঁওয়ের কুর্মিটোলায় অবস্থিত। এই বিমান বন্দর দিয়ে যখন হাজার হাজার সৈন্য আনা হচ্ছিল তখনই তাতে বাঁধা দেয়া উচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন যে গণজাগরণ ছিল তাতে পাক সরকার রাজি না হলে সহজেই সে বিমান বন্দর ঘেরাও করে এই পাক

www.pathagar.com

সৈন্য আনা বন্ধ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ কাজটি করতে ব্যর্থ হওয়ায় লক্ষাধিক পাক সৈন্য এখানে এনে সামরিক জান্তা গণহত্যা চালানোর শক্তি অর্জন করেছিল। আওয়ামী লীগের এ অদূরদর্শিতার কারণেই যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেশ যে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে এ কথা বুঝার পরও আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করেনি। যেহেতু ইসলামী দলগুলোসহ প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করছিল তাই আওয়ামী লীগের উচিত ছিল সবকটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বৃহত্তর মোর্চা গড়ে তোলা। সব দলের সাথে এভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে স্বাধীনতা যুদ্ধেও সবাই সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারতো। আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী উত্থাপনকারী ইসলামী দলগুলোকে চলমান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারাটা আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তারা যদি এ কাজটি করতে পারতো তবে মুক্তিযুদ্ধের চেহারা হতো ভিন্ন রকম।

কিন্তু নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের অহমিকার কারণে জামায়াতসহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলোকে তারা কাছে ভিড়তে দেয়নি। শুধু জামায়াত বা ইসলামী দল নয় অনেক বামদল, বিশেষ করে চীনপন্থী দলগুলোকেও আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হতে দেয়নি। এমনকি বর্ষিয়ান জননেতা মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য কোলকাতায় গেলে তাকে নজরবন্দী করা হয়। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঙলাদেশ পত্রিকার ২১ মে ১৯৭১ সংখ্যার প্রধান হেডিং ছিল:

'ভাসানী কলকাতাতেই অন্তরীণ, কিন্তু সরকার নীরব! দিশেহারা পুত্র পিতার খোঁজে কেঁদে কেঁদে ফিরছেন'।

সংবাদে বলা হয়:

'মাওলানা ভাসানীকে কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখার সংবাদ এপার বাঙলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যুব ও ছাত্র সংস্থাগুলি এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের চেষ্টার বিরাম নেই। ভাসানী কোথায় এবং কিভাবে আছেন জানতে চেয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রী হরেকৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে উদ্বেগের অবসান তো হয়-ইনি, অনেক মহলে বিভ্রান্তি বেড়েছে। ... তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করা হয় যে, তিনি কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি অন্তরীণ।....'

যে মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবেরও আগে ১৯৭০ সালে পল্টনের জনসভায় দাঁড়িয়ে 'পাকিস্তানকে খোদাহাফেজ' জানিয়েছিলেন তাকে অন্তরীণ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এই সিগন্যালই দিল, মুক্তিযুদ্ধে তারা আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কাউকে সহ্য করবে না। যারা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে জানেন তাদের জানা থাকার কথা, আওয়ামী লীগের হিংস্রতার কোন তুলনা নেই। স্পীকার শাহেদ আলীকে তারা সংসদ ভবনের ভেতর চেয়ার দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল, ১৯৬৯ সালে টিএসসির বিতর্ক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র আবদুল মালেককে রেসকোর্সে পিটিয়ে খুন করেছিল। সত্তরের নির্বাচনের সময় দেশের এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে তারা প্রতিপক্ষের সভা-সমাবেশে হামলা করেনি, নির্যাতন-অত্যাচার করেনি।

তাদের নির্যাতনে আহত অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শী জনগণের এইসব তাজা ইতিহাস জানা থাকার কারণে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী রুশপন্থী বাম সংগঠনগুলো ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোন উপায় ছিল না। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ ও বিরোধীদল জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা যে অসম্ভব ছিল তা একটি শিশুও বুঝতে পারবে। একাত্তরের রাজনীতি বুঝতে হলে এইসব ঘটনাপ্রবাহ ও নেপথ্য কারণসমূহ অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ২৬ মার্চ পাক সামরিক জান্তা যে অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সেই অনিশ্চিতের পথেই হাঁটতে হয়েছিল আওয়ামী লীগকে, হাঁটতে হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী দল এবং চীনপন্থী বাম রাজনৈতিক দলগুলোকেও। পরিস্থিতির অনিবার্যতাকে এড়িয়ে যাওয়ার বা অস্বীকার করার সাধ্য ছিল না কারো পক্ষেই।

রক্তাক্ত একাত্তর সামরিক জান্তা সৃষ্ট রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে টালমাটাল সেই দুঃসহ ইতিহাস—যেখানে সবাই ছিল দুর্যোগ কবলিত বিপন্ন মানুষ। এই দুর্যোগ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে; আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবন্দ ভারতে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে; ইসলামী দলগুলো যেহেতু ভারতে যাওয়া সঙ্গত মনে করেনি এবং সেখানে গেলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের 'কচুকাটা' করবে বলে ভয় পাচ্ছিল তাই তারা দেশের সাত কোটি মানুষকে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গড়ে তোলে

www.pathagar.com

'শান্তি কমিটি'। যেসব আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে যেতে পারেনি তারাও এই শান্তি কমিটিতে নাম লিখিয়ে আত্মরক্ষা করে। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা এবং শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সাবের হোসেন চৌধুরীর পিতা যখন ঢাকার শান্তি কমিটির নেতা তখন চট্টগ্রামের শান্তি কমিটির নেতা ছিলেন বিএনপি নেতা ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর (সাকা চৌধুরী) পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী (ফকা চৌধুরী)। পাকিস্তানি জামাই ড. কামাল হোসেন ভারতের পরিবর্তে আশ্রয় পেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলের ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম রাজাকার বাহিনীর জাদরেল লিডার হিসাবে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আওয়ামী লীগ করার পরও তা মুছে যায়নি।

তাই এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়; একাত্তর ছিল রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের বছর– যে ঘূর্ণিঝড় আমাদের জীবনযাত্রাকে সার্বিক অর্থেই তছনছ করে দিয়েছিল। ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এসে দেখলন একজন রাজাকারও ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়কে অস্বীকার করে বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলে ধরেনি বরং তারা সবাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে দেশপ্রেমের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামপন্থীরা প্রমাণ করেছে দেশপ্রেম আসলেই তাদের ঈমানের অঙ্গ।

১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ভূখন্ডটি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামপন্থীরা ছিল তার অনুগত নাগরিক; ১৬ ডিসেম্বর দেশের পতাকা ও নাম বদল হয়ে এ ভূখন্ডটি পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ হিসাবে আবির্ভূত হলে তারা এ রাষ্ট্রের আনুগত্য কবুল করে দেশপ্রেমের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি উপলব্ধি করলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য তাদের দেশপ্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। তাই তিনি সব রকম ভেদাভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে সবাইকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানান। বাংলাদেশের ৩৬ বছরের ইতিহাস সাক্ষী, দেশের প্রতিটি সংকটে, দুর্যোগে ইসলামপন্থীরা যে প্রজ্ঞা, সাহস ও দেশেপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এ দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তা বিপুল ও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

জনাব রাশেদ খান মেননের রাজনৈতিক দর্শন ও ধর্মচিন্তা

ঈদসংখ্যা নয়া দিগন্ত পড়ছিলাম। প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রময় সংকলন। এতে আছে অনেক কিছুই; তবে এর একটিমাত্র প্রবন্ধ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই। প্রবন্ধটি লিখেছেন এ দেশের বাম আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাভাজন রাশেদ খান মেনন। লেখার শিরোনাম দিয়েছেন: *'রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার।'* লেখাটিতে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। এইসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন তার মত করে। তবে রাজনীতি বিশ্লেষণে দ্বিমতের অবকাশ তো থাকবেই। নইলে বহুদলীয় রাজনীতির বিকাশ ঘটবে কি করে? এই দ্বিমত প্রকাশের সুযোগটিই আমি গ্রহণ করতে চাই।

লেখাটি পড়তে পড়তে আমার ছোটবেলার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি হচ্ছে: এক শীতের ভোরে কোন এক ধার্মিক ব্যক্তি পুকুরে গেলেন গোসল করতে। উদ্দেশ্য, পাক-পবিত্র হয়ে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হবেন। ঘাটে গিয়ে দেখেন তার আগেই সেখানে পৌঁছে আরেক ব্যক্তি গোসল করছেন। ধার্মিক ব্যক্তিটি মনে মনে ভাবলেন, ইনিতো আমার চেয়েও পরহেজগার! আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তীব্র শীত উপেক্ষা করে আমার আগেই ছুটে এসেছেন পাক-পবিত্র হতে!

ঘাটের লোকটিও দেখতে পেলো ধার্মিক ব্যক্তিটিকে। সে ছিল এক সিঁদেল চোর। সে মনে মনে ভাবছিল, এ লোকটি তো আমার চেয়েও ধুরন্ধর আর পাকা চোর! লোকজন জেগে উঠতে পারে এই ভয়ে আমি সেই কখন চুরি করা বাদ দিয়ে ঘাটে এসে বসে আছি; আর ইনি কিনা এতোক্ষণ ধরে মহাব্রত চালিয়ে এইমাত্র এলেন গোসল করতে! গল্প গল্পই। কারো ওপর আক্ষরিক অর্থে এ গল্প আমি আরোপ করতে চাই না। তবে এসব গল্পের চিরায়ত একটি আবেদন ও শিক্ষা আছে। শিক্ষাটি হচ্ছে, মানুষ যে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে। নিজের অভিজ্ঞতা ও সামর্থের বাইরে গিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই।

www.pathagar.com

এবার মূল বিষয়ে ফিরে আসি। রাশেদ খান মেনন সারাটি জীবন কাটিয়েছেন বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে। লেনিন, স্ট্যালিন ও মাওসেতুং-এর বই পড়ে দীক্ষা নিয়েছেন সমাজতন্ত্রের। তার যৌবন কেটেছে যখন রাশিয়া ও চীনে সমাজতন্ত্রের রমরমা অবস্থা। শুধু চীন-রাশিয়া কেন, সারা পৃথিবীতেই তখন সমাজতন্ত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত ও বিকাশমান শক্তি। সমাজতন্ত্রের দর্শন আত্মস্থ করতে গিয়েই তিনি জেনেছেন:

'গণতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার আর সমাজতন্দ্র হচ্ছে মেহনতি মানুষের স্বর্গরাজ্য।'

এরকম চিন্তার কারণেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ গণতন্ত্রে যেমন সমাজতন্ত্রের স্থান নেই তেমনি সমাজতন্ত্রেও গণতন্ত্রের জায়গা নেই। কিন্তু দিন বদলে গেছে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ও বিশ্বব্যপী সমাজতন্ত্রের ধ্বস নামার ফলে এখন আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রীদের একটি অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। যদিও তারা জানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্র কখনোই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; কিন্তু এ ছাড়া তাদের এখন আর কোন গত্যন্তর নেই। এই নীতিভ্রষ্টতা যে তাদের জন্য কতবড় দুঃখ ও বেদনার আমরা হৃদয় দিয়েই তা উপলব্ধি করি।

সমাজতন্ত্রের দর্শন আত্মস্থ করতে গিয়ে তিনি আরো জেনেছেন: *'ধর্ম হচ্ছে আফিম স্বরূপ।'* সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন: *'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।'* সর্বহারার রাজ কায়েমের জন্য তাই তারা বেছে নেন বুর্জোয়া নিধনের পথ। হাতে তুলে নেন হাতিয়ার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাদের শ্লোগান ছিল: *'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।'*

অতএব ভুখা মানুষের খাদ্য জোগাড়ের জন্য (ধনিকশ্রেণী যেহেতু স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ গরীবকে দেবে না তাই) অস্ত্রের মুখে লুট করে নাও বুর্জোয়াদের সম্পদ এবং সেই সম্পদ ভাগ করে দাও সর্বহারা মেহনতি মানুষের মাঝে। এভাবেই গড়ে উঠলো এক বিপ্লবী বাহিনী। শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ চটকদার এ শ্লোগানে মোহিত হয়ে ঠাঁই নিল লাল পতাকার তলে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এই সর্বহারা শ্রেণীর দাপটে মানুষের জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিসহ। সেই যে শুরু আজো তার রেশ থামেনি।

পাকিস্তানের ২৪ বছরে এই সশস্ত্র বামরা কত অসংখ্য মানুষকে বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া শ্রেণীর দালাল বলে হত্যা করেছে-সে পরিসংখ্যান হয়তো কোনদিন জানতে পারবে না জনগণ কিন্তু তাদের চোখের সামনে যেসব হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তার কথাও মানুষ কোনদিন ভুলতে পারেনি। তাই সশস্ত্র এইসব বামপন্থীরা জনগণের চোখে ছিল

www.pathagar.com

সুসংগঠিত ডাকাত বাহিনীর চেয়েও ভীতি ও আতংকের কারণ। শক্তি দিয়ে এদের মোকাবেলা করার কথা কে ভাববে? অদৃশ্য আততায়ীর ভয়ে জনগণ মুখে কুলুপ এঁটে রাখলেও তাদের অন্তরের ঘৃণা কিন্তু দিন দিন জমা হচ্ছিল। আর এই ঘৃণার স্রোতে পড়ে কোনদিন বামপন্থা এ দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম ছিল না, যেখানে বাম-বিপ্লবীর আতঙ্কে মানুষ শঙ্কিত ছিল না। কিন্তু তারপরও তাদের আন্দোলনে ধ্বস নামে এই মৃত্তিকাসংলগ্নতার অভাবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সে ঘটনাও কম চমকপ্রদ নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এইসব বাম বিপ্লবীরা ভেবেছিল, আওয়ামী লীগের চাইতে স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। যেহেতু তারা সশস্ত্র এবং অস্ত্র চালনায় পারদর্শী তাই তারা সহজেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব হাতিয়ে নিতে পারবে। তাদের আরও ধারনা ছিল, আওয়ামী লীগের মত বুর্জোয়া সংগঠন তাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। এ স্বপ্ন নিয়েই তারা ঢুকে পড়েছিল মুক্তিবাহিনীতে। হয়তো তাদের স্বপ্ন সত্যি সফল হতো, যদি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী নকশাল নিধনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাদের মোকাবেলার ব্যবস্থা না করতো।

সবাই জানেন, ভারতীয় বাহিনীর আনুকূল্য ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি– বামপন্থীদের প্রতি নয়। তারা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বামপন্থীদের পরিকল্পনার বিষয়টি আঁচ করতে পারেন এবং এদের হাত থেকে আওয়ামী লীগকে রক্ষা করার জন্য বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থার অংশ হিসাবেই ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর পরামর্শে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ওবানের অধীনে ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় 'মুজিব বাহিনী'। ভারতের দেরাদুন সামরিক একাডেমী ও আসামের জাফলং-এ তাদের সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ট্রেনিং শেষে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয় ময়দানে। তাদের মূল কাজ ছিল বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাদের সনাক্ত করে তাদের সমূলে বিনাশ করা। এ কাজ তারা এমন দক্ষতার সাথে করেছিল যে, সেই যে বামপন্থীদের কোমর ভাঙ্গে আজো তা সোজা করার মত শক্তি ও সাহস বামপন্থীরা অর্জন করতে পারেনি।

একাত্তুরে প্রবাসী সরকার কায়েমের সময় বামপন্থী নেতারা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিল। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য ছোটখাট বামদল প্রকাশ্যেই সশস্ত্র লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেহেতু এ দাবী অযৌক্তিকও ছিল না। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা তখন বামপন্থীদের পুনর্বাসনের চাইতে বামপন্থী নিধনে ছিলেন অধিক সক্রিয়। তারা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী তো কানেই তোলেননি বরং এ অপরাধে জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান

www.pathagar.com

ভাসানীকে নজরবন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর নির্দেশে বাংলাদেশের কমুনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং, ন্যাপের মোজাফফর আহমদসহ সব বামপন্থী নেতা এবং কর্মীদের কঠোরহস্তে দমন করেন। মুক্তিবাহিনী থেকে খুঁজে খুঁজে সব বামপন্থী কর্মীদের চিহ্নিত করে কৌশলে তাদের হত্যা করেন।

একাত্তরের সেই সংঘাতময় মুহূর্তে আওয়ামী-বাম আন্তঃপাওয়ার পলিটিক্সে হেরে যায় বামপন্থীরা। তাদের সব নেটওয়ার্ক তছনছ হয়ে যায়। কথায় বলে, বিপদ যখন আসে তখন চারদিক থেকেই সমানে ধেয়ে আসে। বামপন্থীদের বেলায়ও এ প্রবাদটি চরম সত্য হয়ে দেখা দিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করায় চীনপন্থী বাম বিপ্লবীরা চীনের সমর্থন বঞ্চিত হয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়লো। স্নায়ুযুদ্ধে রাশিয়ার অবস্থাও তখন কাহিল। কোমরভাঙ্গা বাম আন্দোলনকে নতুন করে চাঙ্গা করার পরিবর্তে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো নিজেদের ঘর সামলাবার কাজে। যদিও শেষ রক্ষা হলো না তাদের। এর কিছুদিন পরই রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রাসাদ খান খান হয়ে যায়।

রাজনীতিতে বামপন্থীদের পতনের পূর্বাভাস বুঝতে বাকী রইলো না বাম নেতাদের। তারা চোখের সামনে সর্ষে ফুল দেখতে পেলো। তাদের এতদিনের প্রতাপ প্রতিপত্তি মাটির সাথে মিশিয়ে দিল মুজিব বাহিনীর ছত্রছায়ায় ভারতের নকশালবাড়ি আন্দোলন দমনে অভিজ্ঞ জেনারেল ওবানের বাহিনী। গুখরো সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেললে সে সাপ যেমন আর ভয়ের কারণ থাকে না তেমনি বামপন্থীদের বিষদাঁত ভাঙ্গা হয়ে গেলে তাদের আবার কোলে তুলে নিল আওয়ামী লীগ। সাঁপুড়েরা বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ দেখিয়ে যেমন নানা রকম সুবিধা আদায় করে আওয়ামী লীগও তেমনি বামপন্থীদের দিয়ে ভবিষ্যতে সুবিধা আদায়ের আশায় তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইল। ফলে বিপর্যস্ত বামপন্থীদের উদ্ধার করতে এবার এগিয়ে এলো আওয়ামী লীগই।

গরু মেরে জুতা দানের মত বুর্জোয়া আওয়ামী লীগ বাম নেতাদের দিকে বাঁকা চাহনি ও অর্থপূর্ণ হাসি ছুঁড়ে তাদের আশ্বস্ত করলো, এ রক্তদানের বদলে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করবে। এতেই খুশী বাম নেতারা, কারণ এ ছাড়া তাদের আর কীইবা করার ছিল। আওয়ামী লীগ তাদের কথা রেখেছিল, রাজনৈতিক চাল হিসাবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির দুই নীতি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তাতে সমাজতন্ত্র কতটুকু কায়েম হয়েছিল, আশা করি আমার চাইতে ইনু, মেনন এবং তাদের সহযোদ্ধারা তা ভাল করেই জানেন।

www.pathagar.com

বস্তুত তখন থেকেই বাংলাদেশের বাম রাজনীতি আওয়ামী লীগের গৃহপালিত রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাওয়া বদল বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনের পর বাম রাজনীতির সুবিধাবাদী অংশ সমাজতন্ত্র রেখে এখন গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করেছে। যদিও তারা জানে, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে তাদের অবস্থান জামানত বাজেয়াপ্তদের তালিকার উর্ধে উঠার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বুর্জোয়া আওয়ামী তোষণের যে দাসখত তারা একাত্তুরে দিয়েছে তার বাইরে পা ফেলার সাধ্য এই ছত্রিশ বছরেও তাদের হয়নি এবং হওয়ারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের বাম রাজনীতি এখন– বাই দ্যা আওয়ামী লীগ, অফ দ্যা আওয়ামী লীগ, ফর দ্যা আওয়ামী লীগ। তাদের সব তৎপরতাই এখন আওয়ামী লীগ কর্তৃক, আওয়ামী লীগ দ্বারা, আওয়ামী লীগের জন্য। রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকা যেমন মানবতার একমাত্র রক্ষাকবচ ইসলাম আতঙ্কে ভুগছে তেমনি বাংলাদেশের দুর্নীতিপরায়ণ বুর্জোয়া সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরাও ভুগছে সততাপূর্ণ ইসলামী রাজনীতির সম্ভাবনার আতঙ্কে। ইসলামী রাজনীতির পথকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ তার গৃহপালিত বামদের নিয়ে চৌদ্দদলীয় জোট গঠন করেছে এবং নিজেদের হাতে রিমোট রেখে বাকী তের দলকে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে তাদের ইস্যু বাস্তবায়ন করার জন্য। এই তের দলের তৎপরতা যদি আওয়ামী লীগ যথেষ্ট মনে না করে তবে এই তের দলের লোক দিয়ে ছাব্বিশ দল বানিয়ে তাদেরও তারা একই উদ্দেশ্যে মাঠে ছাড়বে।

বাংলাদেশে বাম দলের অবস্থা এখন সেই নাপিতের মত যার ঝোলার ভেতর ছিল একটি আয়না। একবার এক বোকা দৈত্যের সামনে পড়লে দৈত্য বললো: তোকে আমি খাব। চালাক নাপিত বললো: আমাকে খাবে কি, আমিই তো এখন তোমাকে বন্দী করে এই ঝোলায় ভরবো। তোমার মত আরো তের দৈত্য এই ঝোলায় এখন বন্দী আছে। দৈত্য বললো: দেখাও দেখি। নাপিত তখন ঝোলা থেকে একবার আয়না বের করে আবার ঢুকায়। এইভাবে তের বার করতেই দৈত্য হাউমাউ করে কেঁদে বললো: আমায় বন্দী করো না, এমনিতেই আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। আমাদের সৌভাগ্য যে, বাংলাদেশের জনগণ সেই দৈত্যের মত অত বোকা নয়, তাই তারা এখনো বামদের গোলাম হয়নি।

অতএব বলা যায়, এ দেশে বাম দলের ভবিষ্যত এতটুকুই যে, ইচ্ছে করলেও তারা এ দেশের রাজনীতি থেকে মুছে যেতে পারবে না আবার আওয়ামী লীগের অনুমোদন ছাড়া বর্তমানে যে কলেবরে ও অবস্থানে আছে এরচে বেশী বিকশিতও হতে পারবে না। অর্থাৎ তারা বাঁচতেও পারবে না, মরতেও পারবে না।

www.pathagar.com

'রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার' সম্পর্কে রাশেদ খান মেনন যা বলেছেন তা তার বর্তমানের এই রাজনৈতিক অবস্থানকে বিবেচনায় রেখেই মূল্যায়ন করতে হবে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের আরো একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। বৃটিশ-ভারতের কথা বাদ দিলে পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং বাংলাদেশের ৩৬ বছর মোট ৬০ বছর ধরে এই ভূখন্ডে তোড়েজোরেই বাম আন্দোলন চলছে। পলিসিগত কারণেই বাম আন্দোলন শুরু থেকেই দুটি ধারায় যাত্রা শুরু করে। পার্টির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এক গ্রুপ প্রকাশ্যে এবং অন্য গ্রুপ চলে যায় আন্ডরগ্রাউন্ডে। প্রকাশ্য গ্রুপটির কাজ জনমত তৈরী করা ও কর্মী সংগ্রহ আর আন্ডরগ্রাউন্ড গ্রুপটির দায়িত্ব সংগৃহীত কর্মীদের সশস্ত্র ট্রেনিং দিয়ে সর্বহারার রাজ কায়েমের উপযোগী বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা এবং বুর্জোয়া নিধনের নামে ধনিকশ্রেণীর সম্পদ লুটপাটের মাধ্যমে পার্টির জন্য মজবুত ফান্ড গড়ে তোলা। বিগত ৬০ বছর ধরে বাম দলগুলো নীতি বা নেতৃত্বের কারণে বার বার বিভক্ত হলেও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করছে।

এই পদ্ধতির বাইরে কি করে কোন রাজনৈতিক দল চলে সে অভিজ্ঞতা রাশেদ খান মেনন বা আমাদের সম্মানিত বাম নেতাদের না থাকায় তারা সহজেই ধরে নেন বুর্জোয়া দল ছাড়া আদর্শবাদী কোন দল এই পদ্ধতি ছাড়া চলতেই পারে না। তাই তারা বর্তমানের জঙ্গী উত্থানের পেছনে চোখ বন্ধ করেও ইসলামী রাজনীতির হাত আবিষ্কার করেন; যেমনটি রাশেদ খান মেনন করেছেন তার উক্ত প্রবন্ধে। এ জন্যই তার এই অভিযোগকে আমি অস্বাভাবিক মনে করি না। যদি তিনি ইসলামী রাজনীতির বিকাশধারা জানার ও বুঝার সুযোগ পেতেন তবে হয়তো এমনটি বলতেন না। তার নিশ্চয়ই জানা আছে, এই ভূখন্ডে ইসলামী রাজনীতির বয়সও সমাজতন্ত্রের সমান।

বৃটিশ ভারতের পর থেকেই আমরা রাজনীতির এই সময় গণনা শুরু করেছি। সে হিসাবে ইসলামী রাজনীতির বয়স যদি ৬০ বছর ধরি তবে তার ৫০-৫৫ বছর এখানে কোন ইসলামী জঙ্গী ছিল না। এমনকি স্বাধীনতা উত্তর সময়ে যখন এ দেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল তখনো এখানে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটেনি। অর্থাৎ এ দেশের ইসলামী আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বঞ্চিত। এই অনভিজ্ঞ ইসলামী শক্তিকে হঠাৎ করে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কেন হঠাৎ করে জঙ্গীবাদের উত্থান হলো এবং কারা এর মদদদাতা এটি নিঃসন্দেহে গভীর ভাবনার বিষয়। কিন্তু যাদের চোখ-কান খোলা তাদের জন্য বিষয়টি উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়।

জনাব রাশেদ খান মেনন এবং তার সহযোদ্ধাদের নিশ্চয়ই নকশালবাড়ি

www.pathagar.com

আন্দোলনের কথা মনে আছে। কত প্রতিভাবান ছেলে এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল তাও নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। চারু মজুমদার ও তার শিষ্যদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয়টিও আপনারা ভাল করেই জানেন। এ আন্দোলন প্রায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কোলকাতা ও বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির ওপর, কোলকাতার লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীই শুধু নয়; বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপরও নকশালিস্টরা যে প্রভাব ফেলেছিল সে সব কাহিনী এখনো নিশ্চয়ই আপনাদের মনে কিংবদন্তীর মত বিরাজ করছে।

ভারত সরকার এ আন্দোলন কিভাবে দমন করেছিল আপনাদের মত আমরাও সে ইতিহাস কিছুটা হলেও জানি। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী যদি হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী এ আন্দোলনে ঢুকিয়ে দিতে না পারতো তবে নিবেদিতপ্রাণ ওইসব তরুণ যুবকদের কিছুতেই এভাবে নির্বিচারে হত্যা করতে পারতো না এবং এ আন্দোলনকেও ধ্বংস করতে পারতো না। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত করার সময় বিনয়ের সাথে সে ইতিহাসটুকু আপনাদের স্মরণে রাখতে বলি। আপনাদের মত আমরাও লক্ষ্য করছি, এ দেশে ইসলামী আন্দোলন শত বাঁধা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্রমেই অগ্রসর ও শক্তিশালী হচ্ছে। তাদের গণভিত্তি ও প্রভাববলয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ আন্দোলন যত বেগবান হবে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও তত ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতির অভিযোগে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে জনগণ যখন সৎ ও যোগ্য লোকের সন্ধান করছে তখন তাদের সামনে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে উপস্থিত হয়েছে ইসলামী রাজনীতি। বিগত জোট সরকারের আমলে ইসলামী ব্লকের দুজন মন্ত্রীর সততা ও যোগ্যতার দৃষ্টান্ত জনগণকে নতুন আশা ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করেছে। এ অবস্থায় জনগণ যাতে ইসলামী শক্তিকে তাদের শেষ আশা-ভরসারস্থল হিসাবে আকড়ে না ধরতে পারে সে জন্য দেশী-বিদেশী চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

আমরা মনে করি ইসলামী জঙ্গীবাদের সৃষ্টি সেই চক্রান্তেরই একটা অংশ। কারণ জনগণের সামনে আছে ইসলামপন্থীদের বিগত ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবন। তাদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাপন প্রণালী সব এ দেশের মানুষের জানা। তারা যে সৎ তাদের বিরোধীরাও তা স্বীকার করেন। জনগণও তাদের সৎ বলেই জানে। রাশেদ খান মেনন নিজেই বলেছেন, এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ফলে তাদের জনসমর্থনও ব্যাপক। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের সময় তারা যে রেকর্ড পরিমাণ ভোট পেয়ে প্রতারক রাজনীতিবিদদের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে,

www.pathagar.com

তাদের প্রকৃত ভোট তার চাইতে অনেক বেশি। জনগণ সৎ ও সততাপূর্ণ রাজনীতি চাইলেও সৎ রাজনীতিবিদদের এই কারণে ভোট দিতে ভয় পেতো যে, এইসব সাদাসিদা ভাল মানুষরা আমাদের ধুরন্ধর, প্রতারক, অস্ত্র ও পেশী শক্তির অধিকারী রাজনীতিবিদদের কি মোকাবেলা করতে পারবে? যদি না পারে তরে এদের ভোট দেয়ার খেসারত যে আমাদেরকেই গুণতে হবে। এই ভয়টুকুর কারণেই ইসলামী জনতা ইসলামপন্থীদের ভোট না দিয়ে এমন ব্যক্তিদের ভোট দিয়েছে যারা ইসলামী শক্তির লোক না হোক, অন্তত ইসলামের দুশমন নয়।

জনগণের এই বিবেচনাবোধের কারণেই বাম ঘরানার তের দলের (আনলাকি থার্টিন) নিরঙ্কুশ সমর্থন এবং বিদেশি মদদ থাকার পরও স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৬ বছরের অধিকাংশ সময় আওয়ামী লীগকে বিরোধী দলেই অবস্থান করতে হয়েছে। দ্বিতীয় যে ভয়টি জনগণকে ইসলামপন্থীদের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করতো তা হচ্ছে, এই ভাল লোকগুলো কি রাষ্ট্র চালাবার যোগ্যতা রাখে? আলেম ওলামারা কি দেশ চালাবার যোগ্য? রাজনীতিতে যে প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপটের দরকার সে দাপট নেই এদের। তাহলে কোন আশায়, কোন ভরসায় এদের ভোট দেবো?

জনগণের সেই ভয় কাটাবার জন্যই ইসলামী শক্তি এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিগত জোট সরকারের আমলে ইসলামপন্থী দুজন মন্ত্রী যোগ্যতার সাথে মন্ত্রণালয় চালাবার যে অনন্য নজির স্থাপন করেছে তা ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে জনগণের সব ভয়ভীতি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে ইসলামপন্থীদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে তা স্তব্ধ করার জন্য যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই জঙ্গীবাদ তারই অংশ।

তৃতীয়ত আমরা জানি, আন্তর্জাতিক রাজনীতিও আজ ইসলামের বিপক্ষে। পরাশক্তি আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ক্রুসেড পরিচালনা করছে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইসরাইল, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকার সহযোগী হয়েছে। রাশেদ খান মেনন তার প্রবন্ধে ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার সৃষ্টি বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। অতএব তিনি জানেন বিশ্বব্যাপী ইসলামী জঙ্গী তৈরীর দায়িত্বটা আমেরিকাই পালন করছে, কোন ইসলামী আন্দোলন নয়। ইসলামে জঙ্গীবাদের স্থান নেই এবং ইসলামী আন্দোলনও কোনভাবেই জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

তবু যে যুক্তি দেখিয়ে তিনি এবং তার মত জ্ঞানপাপীরা ইসলামী রাজনীতি বন্ধের দাবী জানিয়েছেন সে যুক্তি সত্য বলে ধরে নিলে রাশেদ খান মেননদেরও রাজনীতি করার কোন অধিকার থাকে না। এ যুক্তিটি হচ্ছে, যেহেতু ইসলামী জঙ্গী এবং ইসলামী আন্দোলন উভয়েরই কমন দাবী ইসলামী শাসন অতএব ইসলামী জঙ্গীদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন। তাই জঙ্গীবাদ নির্মূলের জন্য

www.pathagar.com

সবার আগে দরকার ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। তাহলে বলতেই হয়, জাসদ, বাসদ, ওয়ার্কাস পার্টিসহ প্রকাশ্য বাম এবং জনযুদ্ধ, নকশাল পার্টি, সর্বহারাসহ আন্ডারগ্রাউন্ড বামপার্টিগুলো সবারই যেহেতু কমন দাবী সমাজতন্ত্র সেহেতু সশস্ত্র বাম ক্যাডারদের নির্মূল করতে হলে সবার আগে দরকার চৌদ্দদলভুক্ত তের বাম দলসহ সব বাম দল নিষিদ্ধ করা।

বিগত ৬০ বছর ধরে এ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে, সর্বহারার রাজ কায়েমের নামে, বুর্জোয়া নিধনের নামে জঙ্গীবাদের যে বিস্তার ঘটেছে তার দায় অবশ্যই রাশেদ খান মেননদের নিতে হবে। যে যুক্তিতে তিনি ইসলামী রাজনীতি বন্ধের দাবী জানিয়েছেন সে যুক্তি সত্য ধরে নিলে বামজঙ্গীদের হত্যার রাজনীতির দায় তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না। যেহেতু গোপন বাম রাজনীতি এখনো সক্রিয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক, অভিজ্ঞতা, হত্যাকান্ডের বিশাল পরিসংখ্যানের তুলনায় ইসলামী জঙ্গীদের উত্থান ও অবস্থান শিশুতুল্য তাই সর্বাগ্রে এই বামরাজনীতি নিষিদ্ধের কোন বিকল্প নেই। জঙ্গী মদদের অভিযোগে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হলে তার আগে একই অভিযোগে বাম রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

তারপর আরো কথা আছে। রাশেদ খান মেননের অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিলে সেই একই অভিযোগে তিনি হয়ে যান আত্মস্বীকৃত খুনি। কারণ নিষিদ্ধ সশস্ত্র বাম রাজনীতির বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য। বাম ক্যাডাররা খুনগুলো করে ঘোষণা দিয়ে এবং এসব বামরা মেনন ইনুদের নেতাও মানেন। ফলে এরা যে আত্মস্বীকৃত খুনি সে ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে তা একটি অভিযোগ মাত্র। এ অভিযোগটি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনকে দোষী সাব্যস্ত করা সঙ্গত নয়।

এ পর্যন্ত যেসব ইসলামী জঙ্গীকে ফাঁসী দেয়া হয়েছে এবং যারা এখনো বন্দী বা রিমান্ডে আছেন তারা প্রত্যেকেই বলেছেন, প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সাথে তাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বরং ইসলামী রাজনীতির প্রচলিত ধারার সাথে বনিবনা না হওয়াতেই তারা জঙ্গী পন্থা বেছে নিয়েছেন। প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির ধারক বাহকরাও বলছেন, জঙ্গীবাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে, এটি একটি বানানো অভিযোগ এবং এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের সূত্র ধরে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকতে পারে না।

এ দেশে বামপন্থীদের ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার আদর্শগত কোন কারণ নেই। তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তাই ঘটছে। এর কারণ কি? পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন এর দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত. এক সময় যখন সারাদেশে বুর্জোয়া নিধনের নেটওয়ার্ক জোরালো ছিল তখন সারাদেশ থেকে

www.pathagar.com

নেতাদের চলার জন্য এবং পার্টি চালাবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ফাণ্ডে জমা হতো এখন অর্থের সে সরবরাহ স্তিমিত হয়ে গেছে। বুর্জোয়া বড় দলের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তারা এখন পার্টি এবং সংসার চালাতে অপারগ। সেই বুর্জোয়া বড় দল যদি চায় তবে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান না নিয়ে তাদের কোন উপায় নেই।

এটিই হচ্ছে গৃহপালিত বাম রাজনীতির সবচে বেকায়দাজনক অবস্থা। যে কারণে আদর্শের সাথেও আজ আপোষ করতে হচ্ছে তাদের। তারা যে এভাবে বড় দলের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েই টিকে আছেন সে কথাটি কেবল অনুমান নির্ভর নয় বরং ক্ষমতা ছাড়ার পর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা থাকাকালীন সময়ে এই বাম নেতাদের কাকে কত মাসোহারা দিতেন মিডিয়ার সামনে নিজেই তা উল্লেখ করেছিলেন।

দ্বিতীয় যে কারণ তা হচ্ছে, এ দেশে বাম রাজনীতির বিকাশ ঘটেছিল রাশিয়া ও চীনের প্রত্যক্ষ মদদে। রাশিয়ার পতনের পর চীনও প্রতিযোগী হারিয়ে নিজের হাত গুটিয়ে নেয়। ফলে চীন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাম নেতারা নিয়মিত যে মাসিক মাসোহারা পেতো তা বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা পুঁজিবাদী বিশ্বের তাবেদার শক্তিতে পরিণত হয়। যেহেতু পুঁজিবাদী বিশ্বের মোড়ল আমেরিকা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সেহেতু বাংলাদেশের তাবেদার বাম নেতাদেরও ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী তুলতে হচ্ছে। এভাবেই মার্কিন বিরোধী বামরা এখন মার্কিন পোষকে পরিণত হয়েছেন।

কিন্তু এক এগারোর পটপরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতির মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী চলছে অভিযান। বাম রাজনীতিবিদরা মাসোহারা বন্টনের যে রীতি রপ্ত করেছেন তা নিঃসন্দেহে দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম। জনগণ এদের কোনদিন চায়নি, এখনো চায় না, ভবিষ্যতে চাবে এমন কোন সম্ভাবনাও নেই। বরং রাজনীতিতে তারা যে পঙ্কিলতা ও দুর্বৃত্তায়নের জন্ম দিয়েছে এবং এখানো চর্চা করছে তা বন্ধ না করলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন তাদের জনতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের জন্মদাতা এই বাম নেতাদের হিসাব দিতে হবে বুর্জোয়া নিধনের নামে বিগত ৬০ বছরে তারা কত মানুষ হত্যা করেছে? সর্বহারার রাজ কায়েমের শ্লোগানে মুগ্ধ হয়ে কত তরুণ যুবক তাদের ডাকে আত্মাহুতি দিয়েছে? 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে রাজপথে ডেকে এনে কত অসংখ্য কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে? কর্মহীন এই শ্রমিকদের কতজন অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে? যারা সর্বহারার প্রেমে চোখের জলে বুক

www.pathagar.com

ভাসায় কাদের রক্তের বিনিময়ে তারা আজ দামী বাড়ি-গাড়ির মালিক?

রাশেদ খান মেননের প্রবন্ধটি পড়লে মনে হয়, বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি এখন এক কঠিন সময় ও ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তবে আল্লাহ যাদের নেগাহবান কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারে না। আমরা দেখেছি, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য যারা ইসলামী জঙ্গীবাদের জন্ম দিয়েছিল তাদের সে চেষ্টা মাঠে মারা গেছে। ইসলামের দুশমনদের পাতা ফাঁদে পড়ে যারা জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল তাদের জবানবন্দীই ইসলামী আন্দোলনকে নির্দোষ প্রমাণ করেছে। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কুচক্রীরা মহানবীর নামে ব্যঙ্গ কার্টুন এঁকে, কাবাকে বাইজি পাড়া ও রবীন্দ্রনাথকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে এ দেশের মুসলমানদের উত্তেজিত করতে চেয়েছিল যাতে সহজেই মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসাবে চিত্রিত করা যায়।

তাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জনগণ রাজপথের পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই শুরু করেছে। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন এখন যে পর্যায় অতিক্রম করছে তাতে এভাবে একের পর এক ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ধারা যে অব্যাহত থাকবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। যদি এ দেশের ইসলামী আন্দোলন তাদের কোন ফাঁদেই পা না দেয় তবে নকশালবাড়ি আন্দোলনে যেমন হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ে সে আন্দোলনকে ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছিল বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তেমন প্রচেষ্টা চালাতেও ষড়যন্ত্রকারীরা দ্বিধা করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ব রাজনীতিতে আজ যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে বামপন্থীদের উচিত ছিল ইসলামী রাজনীতির সাথে হাত মিলিয়ে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা যে লড়াই শুরু করেছিল সে লড়াই এখন চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামপন্থীরাই। রাশেদ খান মেনন নিজেই স্বীকার করেছেন, রাশিয়ার পতনের পর সাম্রাজ্যবাদ এখন ইসলামকেই তাদের প্রতিপক্ষ বিবেচনা করছে। এই সাম্রাজ্যবাদীরাইতো সমাজতন্ত্রের মূল শত্রু। সে বিবেচনায় সাম্রাজ্যবাদ নিপাতের ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীরাই হতে পারে সমাজতন্ত্রীদের সহায়ক শক্তি। এ শক্তিকে দুর্বল করার যে কোন চেষ্টা বুর্জোয়া রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা করারই নামান্তর। দুএকজন সুবিধাবাদী বাম নেতা এসব কথা না বুঝলেও আদর্শবাদী বাম আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা নিশ্চয়ই আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করবেন। তাদেরই কেউ কেউ গৃহপালিত তাবেদার রাজনীতির পথ পরিহার করে সত্য-সুন্দর ও সততাপূর্ণ রাজনীতির পথ ধরলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন : যেভাবে যাত্রা হলো শুরু

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার

ঈদসংখ্যা নয়া দিগন্তে জনাব রাশেদ খান মেনন *'রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার'* সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে তিনি লিখেছেন:

'উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার অতি পুরনো।' রাজনীতিতে ধর্মের এই অতি পুরনো কালের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছেন: *'ব্রিটিশ শাসন বিরোধিতার বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ, যাকে কার্লমার্কস ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে সিপাহিদের ধর্মীয় ভাবাবেগ কাজ করেছিল। বন্দুকের কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বির সংমিশ্রন আছে এবং সেই কার্তুজ দাঁতে কাটতে হবে এই ধর্মীয় আচারবিরোধী ব্যবস্থা সাধারণ সিপাহিদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। খেলাফতের প্রশ্নে দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও ধর্মবোধ কাজ করেছে।*

বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়েও আমরা সেসব সংগ্রামে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করি। সন্যাসবিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, সাঁওতাল বিদ্রোহের আদি পর্বে কৃষক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনা তাদের সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছে। অগ্নিযুগের বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহী তরুণরা 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানে শপথ নিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সাধারণ মানুষের ধর্মচেতনার এই ব্যবহার কোনো আরোপিত বিষয় ছিল না, সেটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ব্রিটিশের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আর্থসামাজিক উপাদানের পাশাপাশি এই ধর্মীয় উপাদানও কাজ করেছে।'

জনাব রাশেদ খান মেননের বক্তব্য থেকেই জানতে পারি, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়; বরং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার চলে আসছে বহু কাল আগে থেকেই। মানুষের স্বাধিকার চেতনা, অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার চেতনা মানুষ পেয়েছে

www.pathagar.com

ধর্মের কাছ থেকেই। বৃটিশ ভারতের প্রতিটি আন্দোলনে ধর্মের সম্পৃক্ততা থেকেই প্রমাণ হয় তখন সভ্যতার বিকাশ ও প্রগতির প্রধান নিয়ামক ছিল ধর্ম। ধর্মীয় আবেগ মানুষের জীবনধারাকে সতত সামনের দিকেএগিয়ে দিয়েছে, কখনো পেছনের দিকে নয়। রাজনীতিতে ধর্মের এই ব্যবহার ছিল সততই কল্যাণকর ও অপরিহার্য। এরপর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব দেখাতে গিয়ে জনাব রাশেদ খান মেনন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও সাতচল্লিশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। ধর্মই তখন এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করেছিল। তিনি জানিয়েছেন:

'দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশে বসবাসরত মুসলমান ও হিন্দুদের দুটি জাতি হিসাবে ভাগ করে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রভূমির দাবি উত্থাপন করা হয়। মুসলমানদের সংগঠন হিসাবে মুসলিম লীগ আলাদা রাষ্ট্রের দাবী তোলার জন্য অভিযুক্ত হলেও সর্বভারতের সংগঠন হিসাবে ভারতীয় কংগ্রেসও এ ধরনের ধর্মভিত্তিক চেতনার বাইরে ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধর্মবোধ কাজ করত, সেটা এ দেশের মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করেছে।'

বস্তুতঃ একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভারতের মুসলমান এবং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে হিন্দুরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলেই অবশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ দুশো বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলে উপমহাদেশের মানুষ কোনদিনই বৃটিশের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারতো না। রাজনীতিতে ধর্মের যথার্থ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল বলেই ভারতীয় উপমহাদেশে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। আর সবাই জানেন, পাকিস্তান হয়েছিল বলেই স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

অতএব আজকে যারা বাংলাদেশের মাটিতে বসে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ করার দাবী তোলেন তারা মূলতঃ ইতিহাসের গতিধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চান। শেকড় ও কান্ড থেকে বিকশিত পুষ্পকে আলাদা করতে চান। নিজেদের বংশ পরিচয় ভুলে যেতে চান। ধর্মের যে মানবিক ও কল্যাণকর দিক আছে তা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করতে চান। মানুষের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকার যে শিক্ষা ও প্রেরণা ধর্ম মানুষকে দান করে সেই শিক্ষা ও চেতনা ভুলিয়ে আবার আমাদের সাম্রাজ্যবাদের গোলাম বানাতে চান। তারা ভুলে যান রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ

www.pathagar.com

করতে পারছি।

এরপর জনাব রাশেদ খান মেনন সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারতের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন:

'দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের এই ব্যবহার পাকিস্তানের রাজনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ... রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের এই ক্রমধারাতেই পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয়।... পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ সাহেব এই দেশটিকে সার্বভৌম দেশ হিসাবে গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ধর্মকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন। এর প্রধান কারণ ছিল বিভিন্ন জাতিবৈচিত্রের দেশ পাকিস্তানে ধর্মই ছিল একমাত্র সাধারণ বন্ধন, অন্য কিছু নয়।'

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, নীতিগতভাবে ধর্মের কল্যাণকর প্রভাবকে গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তানী শাসকচক্রও রাজনৈতিক ঘোষণা প্রদান করেছিল। কিন্তু ধর্মের কাঙ্খিত কল্যাণের পথে পাকিস্তানী শাসকরা যে দেশকে নিয়ে যেতে পারেননি পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ। কিন্তু কেন পারেননি? দোষটা কার? ধর্মের, নাকি পাকিস্তানী শাসকদের, নাকি সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশের?

এ প্রশ্নের জবাব জানা আমাদের জন্য খুবই জরুরী। এই দোষীকে সনাক্ত করতে না পারলে আমরা বুঝতে পারবো না কারা আমাদের দুর্গতির জন্য দায়ী। ভুল রোগ নির্ণয় আর ভুল চিকিৎসার কুফল আমরা ভোগ করেছি বিগত ৬০ বছর। এখনো আমাদের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা সেই ভুল চিকিৎসার শিকার; যে কারণে দুর্ভোগ আমাদের পিছু ছাড়ছে না। ভুলের পরে ভুল, সেই ভুলকে শোধরাবার জন্য আবার ভুল এবং তার থেকে মুক্তির জন্য আমরা আরারো ভুল করে যাচ্ছি। জাতিকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কখনো বুঝে আবার কখনো না বুঝে আমাদের সেই ভুলের পথে পরিচালনা করেছেন।

রাজনীতিতে ধর্মের সঠিক ব্যবহার হলে সেই সব নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থ বাঁধাগ্রস্ত হতো বলে তারা আমাদের কখনোই সে পথে পরিচালিত করেননি। জনাব রাশেদ খান মেননও এই দোষী নির্বাচনে বরাবরের মত ভুল করেছেন অথবা নিজের ভ্রান্ত রাজনৈতিক দর্শন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য জেনেবুঝেই ভুল মূল্যায়ন হাজির করেছেন। এ জন্য তিনি কাকে দায়ী করেছেন? দায়ী করেছেন ধর্মকে, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় ইসলামকে। সে জন্য ইসলামকে দূরে সরিয়ে তারা বিগত ষাট বছর ধরে জনগণের যতই কল্যাণ করার চেষ্টা করছেন ততই জনগণ দুর্গতির আরো গভীর অতলে ডুবেছে। এটাই ইতিহাস এবং এ ইতিহাসের সাক্ষী এ দেশের নিগৃহীত জনগণ। আমাদের প্রতারক রাজনীতিবিদরা

www.pathagar.com

কখনোই জনগণকে আসল সত্য জানতে দেয়নি।
রাশেদ খান মেনন অবশ্য বলেছেন:

'ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারত নিজেকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গুছিয়ে নিতে পারলেও পাকিস্তানে প্রথম থেকেই সেটা বাধাগ্রস্ত হয়।'

কেন এবং কারা তা বাধাগ্রস্ত করে সে কথা তিনি বলেননি; হয়তো বলতে চাননি। আমাদের জাতিগত দুর্গতির কারণ নির্ণয়ে এই বাধাগ্রস্তকারীদের চিহ্নিত করাও অপরিহার্য। যেহেতু এ ব্যাপারে তিনি মুখ খোলেননি অথচ এটিই সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এ ব্যাপারটি প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করতে হবে তা হচ্ছে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পরও কেন পাকিস্তানী জনগণ রাজনৈতিকভাবে ইসলামের সুফল থেকে বঞ্চিত হলো? আমার বিবেচনায় এ জন্য প্রধানত দুটো গ্রুপ দায়ী।
এক. পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকার।
দুই. পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় আন্দোলন।

যাদের কারণে রাশেদ খান মেননের ভাষায়, ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারত নিজেকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গুছিয়ে নিতে পারলেও পাকিস্তানে প্রথম থেকেই সেটা বাধাগ্রস্ত হয়। পাকিস্তান সরকারের মত এই বাধাগ্রস্তকারী শক্তিও আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সামগ্রিক দুর্গতির পেছনে এ দুটো গ্রুপ কিভাবে দায়ী এবার আমরা তা একটু খতিয়ে দেখবো।

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকারের ব্যর্থতা

পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী একটি আন্দোলন– এটি কোন ইসলামী আন্দোলন ছিল না। মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখ্য টার্গেট ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটা তারা করেছিলেন। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার মুখ্য টার্গেট নিয়ে এ আন্দোলন ছিল না এবং সে রকম কোন প্রস্তুতিও আন্দোলনের নেতাদের ছিল না। তাই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পরও পাকিস্তানে তারা ইসলামী শাসন চালু করতে পারেননি। আমাদের বুঝতে হবে, মুসলিম শাসন আর ইসলামী শাসন এক জিনিস নয়। রাশেদ খান মেনন ধর্মীয় পরিচয়ের সুবাদে একজন মুসলমান। তিনি যদি কখনো ক্ষমতায় থাকেন তবে তার সময়কালকে মুসলিম শাসনকাল বলে অভিহিত করা যাবে তবে তার শাসনকাল ইসলামী শাসনকাল হবে না। সেটা ইসলামী শাসনকাল তখনই হবে যখন তিনি ইসলামী বিধানমতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন অর্থাৎ কোরআন ও

www.pathagar.com

হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক দেশ চালাবেন।

রাজনীতিতে ধর্মের সুফল পেতে হলে ধর্মের আলোকে রাজনীতি পরিচালনা করতে হবে– কিন্তু সেটা পাকিস্তানের শাসকরা করতে ব্যর্থ হন। এটা শাসকদের ব্যর্থতা, ধর্মের ব্যর্থতা নয়। কিন্তু সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদগণ এটাকে শাসকদের ব্যর্থতা না বলে ধর্মের ব্যর্থতা হিসাবে যুগ যুগ ধরে আমাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। ভুল রোগ নির্ণয়ের সূত্রপাত ঘটেছে এভাবেই। ফলে আমরা ধর্মবিমুখ হতে শিখেছি, ধর্মহীন হতে শিখেছি এবং এভাবে ধর্মীয় কল্যাণ ও আল্লাহর রহমত থেকে আমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে এনেছি। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে; ধর্ম মানুষকে যে পরিশুদ্ধতার শিক্ষা দেয় সে শিক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। সততার পরিবর্তে আমরা শিখেছি দুর্নীতি, ওয়াদা রক্ষার পরিবর্তে শিখেছি প্রতারণা। যেহেতু পরকালের জবাবদিহীতার ভয় নেই তাই অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, মিথ্যাচার, অনাচার, কপটতা, লুণ্ঠন, ভন্ডামীতে আমরা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছি। সামগ্রিকভাবে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানবতা ও সভ্যতা। আমরা পরিণত হয়েছি মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত স্বার্থান্ধ পাশবিক শক্তিতে। রাজনীতিতে এসেছে দুর্বৃত্তায়ন। রাজনীতিতে সেবার স্থান দখল করেছে পেশী ও কালো টাকা।

কেন এমনটি হলো? কেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পরও পাকিস্তানী শাসকরা পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমে ব্যর্থ হয়েছিলেন? তাহলে অনিবার্যভাবেই এ প্রশ্নটি এসে পড়ে। এ প্রশ্নের জবাবটিও আমাদের জানা দরকার।

সবাই জানেন, তেতুল গাছে আপেল হয় না, কাঁঠাল গাছে কমলা ফলে না। যে কোন কাজ সমাধা করার জন্য প্রয়োজন সে কাজের দক্ষ জনশক্তি। কবিকে দিয়ে যেমন প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না তেমনি ইঞ্জিনিয়ার দিয়েও চিকিৎসা চলে না। ইসলাম সম্পর্কে প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব এবং পরিপূর্ণ ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা দক্ষ জনশক্তি ছাড়া ইসলামী শাসন চালু করা সম্ভব নয়। শাসনতন্ত্রের মাথায় ইসলাম লাগালেই সে শাসন ইসলামী শাসন হয়ে যায় না, যেমন সংবিধানের শুরুতে সমাজতন্ত্র লাগালেই সে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যায় না। যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজন সেই আদর্শের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী। বাম রাজনীতিবিদরা আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে যেমন সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারেননি তেমনি মুসলিম লীগের ঘাড়ে সওয়ার হয়েও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।

জনাব রাশেদ খান মেননকে সে জন্যই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে দুঃখ করে বলতে হয়েছে:

সমাজতন্ত্রের অপপ্রয়োগে এক ধরনের অবাধ লুটপাটতন্ত্রের জন্ম দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

এই লুটপাটতন্ত্রই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পুরনো কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন শাসনামলে বর্ধিত হয়ে এখন অর্থনৈতিক মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট এই লুটপাটতন্ত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনবৈষম্য, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলছে। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে।'

বাংলাদেশের অর্থনীতির যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন সে জন্য কি তিনি সমাজতন্ত্রকে দায়ী মনে করেন? না, তা তিনি করেন না। সে জন্যই তিনি বলেছেন, সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ নয় বরং অপপ্রয়োগের ফলেই জনগণ সমাজতন্ত্রের কাঙ্খিত সুফল ভোগ করতে পারেনি; তেমনি যারা ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তুলছেন তারাও জানেন ধর্মের প্রয়োগ নয় বরং অপপ্রয়োগের ফলে পাকিস্তানী শাসকরা জনগণকে ধর্মীয় রাজনীতির সুফল থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের জানা থাকার কথা, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন দাবী করার অপরাধে জামায়াতে ইসলামীকে সে সময় চরম নিগ্রহের শিকার হতে হয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়।

অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসকরা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ও আস্থাহীনতাই শুধু প্রদর্শন করেছেন, ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন। সমাজতন্ত্রে অপপ্রয়োগের জন্য যেমন সমাজতন্ত্র দায়ী নয় তেমনি ধর্মের অপপ্রয়োগের জন্যও ধর্ম দায়ী হতে পারে না। দায়ী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাহীন নেতৃত্ব, দায়ী রাজনীতিবিদদের সুবিধাবাদী চরিত্র। যেহেতু সুবিধাবাদী পাকিস্তানী শাসকদের চরিত্র আর বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদদের চরিত্রে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই; উভয়েই রাজনীতিতে ধর্মের কল্যাণকর প্রয়োগের বিরোধী, উভয়েই লুটপাটতন্ত্রে বিশ্বাসী তাই এ সত্যটি তারা জনগণকে কোনদিনই বুঝতে দেয়নি। চোরে চোরে মাসতুতু ভাই সেজে জনগণকে সত্য থেকে দূরে রাখার জন্যই ছিল তাদের সব সাধনা, সব প্রচেষ্টা। ধর্মীয় রাজনীতির কল্যাণের ছোঁয়া যাতে জনগণকে স্পর্শ করতে না পারে সে জন্য সমস্বরে তারা মিথ্যাচার শুরু করলো।

তাদের অপরাজনীতির কুফলের সব দায় তারা তুলে দিল ধর্মের ঘাড়ে– একবারও বললো না, জাতীয় রাজনীতি থেকে ধর্মকে বর্জন করার ফলেই জাতি নিমজ্জিত হয়েছে সীমাহীন অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনের। যেহেতু বিগত ষাট বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে রাজনীতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখার কারণেই রাজনীতিতে এসেছে দুর্বৃত্তায়ন, রাজনীতিবিদরা সুযোগ পেয়েছে প্রতারণা ও লুণ্ঠনের, মানুষের অধিকার হরণের– তাই এই বিপর্যয় থেকে মুক্তির পথ একটাই হতে পারে– রাজনীতিতে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার আলোকে

www.pathagar.com

রাষ্ট্র পরিচালনা।

জনাব রাশেদ খান মেননরা যদি সততার রাজনীতি করতেন তবে পাকিস্তানী শাসকদের অপকর্মের দায় কখনোই ধর্মের ওপর চাপিয়ে দিতে পারতেন না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্নীতির জন্ম এবং তার ব্যাপক বিস্তারের জন্য সমাজতন্ত্রকে দায়ী করার সময় যেমন বলেছেন সমাজতন্ত্রের অপপ্রয়োগের ফলেই তা হয়েছে; তেমনি পাকিস্তানী শাসকদের অবিচার ও নীতিহীনতার কারণ চিহ্নিত করে বলতেন, ধর্মের অপপ্রয়োগের ফলেই এমনটি ঘটেছিল।

অপপ্রয়োগ আর প্রয়োগের ফলাফল কখনো এক হয় না। রোগ নিরাময় হয় মাত্রামত সঠিক ঔষধ প্রয়োগের ওপর। ঔষধ যত দামী আর ভালই হোক না কেন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে তাতে কোন উপকার পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে দোষটা ঔষধের নয়, দোষটা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের। রাশেদ খান মেননরা চিকিৎসকের দায় ঔষধের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বরাবর জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন। যেহেতু আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতিবাজদের সংখ্যাই বেশি তাই তারা জেনেবুঝে এবং পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে যখন কোন মিথ্যাচারের কোরাস শুরু করেন তখন জনগণের পক্ষে বিভ্রান্ত না হয়ে আর কোন উপায় থাকে না।

কেন ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তোলা হচ্ছে

বাম ও নষ্ট রাজনীতিবিদদের জানা থাকার কথা, কোন আদর্শের ভাল বা মন্দ নির্ভর করে সেই আদর্শের দার্শনিক ভিত্তি এবং তার গৃহীত নীতির ওপর। কেউ সে নীতির যথার্থ প্রয়োগ না করলে সে জন্য আদর্শ দায়ী হয় না, দায়ী হয় প্রয়োগকারী। তবে উক্ত আদর্শের দার্শনিক ভিত্তি এবং গৃহীত নীতির ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকলে তার দায় অবশ্যই সে আদর্শকে বহন করতে হবে।

তিনি এবং কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী তুলেছেন– অর্থাৎ ধর্মীয় রাজনীতি প্রয়োগ বা ব্যবহারকারীদের প্রসঙ্গটা এখানে মুখ্য নয়। বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, ত্রুটিটা প্রয়োগকারীর নয়, খোদ আদর্শ ও নীতিমালার। যেহেতু এ দেশের ৮৫ ভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম তাই এখানে ধর্ম বলতে তিনি নিশ্চয়ই ইসলামকেই বুঝিয়েছেন।

আমরা জানি, ইসলামী আদর্শ লিপিবদ্ধ আছে পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে। তার মানে সমস্যাটা কোরআন এবং হাদীসের। তাহলে কোরআন ও হাদীসের কোন্ কোন্ নীতি তিনি নিষিদ্ধ করতে চান তা পরিষ্কার করে বলা দরকার। তিনি কি সমগ্র কোরআন ও সবকটি হাদীস নিষিদ্ধ করতে চান? নাকি কোরআনের রাজনীতি বিষয়ক আয়াত ও রাজনৈতিক বক্তব্য-প্রধান হাদীসগুলোর নিষিদ্ধতা তার দাবী?

www.pathagar.com

তাহলে তো সে আয়াত ও হাদীসগুলো আগে তার সনাক্ত করা দরকার। তিনি কিন্তু এসব বিষয়ে কিছুই পরিষ্কার করে কিছু বলেননি।

ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী তোলার মানেই হচ্ছে ধর্মে রাজনীতি আছে; নইলে তিনি তা নিষিদ্ধ করার দাবী তুলবেন কেন? কথা হচ্ছে, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী করা কি মানুষের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা নয়? আমাদের সংবিধান, সভ্য পৃথিবীর প্রচলিত আইন এবং জাতিসংঘ সনদ কি মানুষের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়? তাহলে তিনি এবং আরো যারা এ দাবী তুলছেন তারা কিসের ভিত্তিতে এরকম উদ্ভট দাবী নিয়ে মাঠ সরগরম করছেন?

জনাব রাশেদ খান মেনন হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, মানুষের অধিকার হরণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য ধর্মকে দায়ী করেছেন। আমার প্রশ্ন, কোন্ ধর্ম নির্বিচারে মানুষ হত্যা অনুমোদন করেছে? কোন্ ধর্ম ধর্ষণের অনুমতি দিয়েছে, লুণ্ঠনের অনুমতি দিয়েছে? মানুষের অধিকার হরণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য কোন ধর্ম কি আদৌ দায়ী? এগুলো কি কোন ধার্মিকের কাজ; নাকি অধার্মিকের? চরিত্রহীন পাকিস্তান সরকারের অপকর্মের দায় যারা ধর্মের ওপর চাপাতে চান এ প্রশ্নগুলো তাদের করা কি খুব অযৌক্তিক হবে? ধর্মের নামে কোন অপকর্ম কেউ করলে তার দায় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর– এ জন্য ধর্মকে দায়ী করা কখনোই সঙ্গত হতে পারে না।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সূচনা ও পাকিস্তানের বিরোধী আন্দোলন

আমরা দেখেছি, রাজনীতিতে ধর্মের যথাযথ প্রয়োগ না করার ফলে পাকিস্তানী শাসনামলে জনগণ কি নিদারুণ সংকটে নিপতিত হয়েছিল। জেনেছি, শাসকদের চরিত্রে ইসলাম না থাকার কারণে দীর্ঘ ২৪ বছরেও পাকিস্তানী শাসকরা কোরআনের শাসন তথা ইসলামী শাসন কায়েম করতে পারেনি। ফলে রাজনীতিতে নীতিহীনতা ও দুর্বৃত্তায়ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিস্তার ঘটে হিংসা, হানাহানি ও দমন-পীড়ন। মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। এ জন্য যেমন দায়ী পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায় তেমনি দায়ী পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় আন্দোলন।

জনাব রাশেদখান মেনন এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিলেও বিস্তৃত আলোচনায় যাননি। তিনি বলেছেন:

'ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারত নিজেকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গুছিয়ে নিতে পারলেও পাকিস্তানে প্রথম থেকেই সেটা বাধাগ্রস্ত হয়।'

কেন এবং কারা তা বাধাগ্রস্ত করে সে কথা তিনি বলেননি; হয়তো বলতে চাননি। যাদের ইতিহাসের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারা জানেন ১৯৪৭ সালে ভারত ও

www.pathagar.com

পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পূর্বেই ভারতীয় উপমহাদেশে কমুনিস্ট আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটে'। ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হলে তাতে ক্ষমতাসীন হয় এ উপমহাদেশের দুই জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস। জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্ষমতায়নের পর কমুনিস্ট আন্দোলন ছাড়া তেমন কোন রাজনৈতিক শক্তি এখানে ছিল না যারা বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ দেশে কমুনিস্টরাই বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এ কমুনিস্টদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল:

'ধর্ম হচ্ছে আফিম স্বরূপ। ... বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।'

ফলে ধর্মের বিরুদ্ধে তারা বন্দুকের নল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই কমুনিস্টরাই যেহেতু রাশেদ খন মেননদের রাজনৈতিক গুরু এবং তারাই সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গুছিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেন সে জন্য তিনি *'ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারত নিজেকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গুছিয়ে নিতে পারলেও পাকিস্তানে প্রথম থেকেই সেটা বাধাগ্রস্ত হয়'* বলে তার মন্তব্য শেষ করেছেন। তারা তখন পরাশক্তি রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক চীনের মদদপুষ্ট হয়ে গণযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের অপরিপক্ক প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথকে বাধাগ্রস্ত করেছিলেন।

যে ইসলাম আমাদেরকে দুশো বছরের গোলামী মুক্ত করে স্বাধীন জীবন ফিরিয়ে দিল সে ইসলাম থেকে জনগণকে মুক্ত করার ব্রত নিয়ে শুরু হল স্বাধীন দেশের বিরোধী আন্দোলন। ইসলাম বিরোধিতার মধ্য দিয়ে জন্ম নিল নতুন রাজনীতি। যে রাজনীতি বিগত অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে আমাদের শাসন করেছে; শোষণ করেছে এবং নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের জীবন মান ও সমাজ সভ্যতা।

সব সময়ই সরকারের চাইতে বিরোধী দল থাকে জনগণের কাছে সুবিধাজনক স্থানে। সরকারের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরার কারণে তারা জনগণের কাছাকাছি থাকে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরোধী রাজনীতির নিয়ামক শক্তি কমুনিস্টরা গণমানুষকে এই ধর্মবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য শ্লোগান তুলল:
'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।'

এ দেশের মানুষ সব সময়ই বাস করেছে দরিদ্রসীমার নিচে। ফলে সহজেই তারা বামদের চটকদার শ্লোগানে মোহিত হয়ে পড়লো, তারা এগিয়ে এলো বাম নেতাদের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য। বাম নেতাদের চোখে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিন্তু ধর্মবিরোধিতার কারণে জনগণ পড়লো দ্বিধায়। তারা অভাব ও দারিদ্র থেকে মুক্তি চায় আবার ধর্মের মধ্যেও টিকে থাকতে চায়।

www.pathagar.com

বামদের অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান যেমন তাদের ভাল লাগে তেমনি ভাল লাগে ধর্মের বন্ধন। কিন্তু দুটোকে একসাথে ধারণ করা সম্ভব নয়; বামদের দাবী হলো, এ দুয়ের যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। ধর্মকে বাদ দিয়ে জনগণ সমাজতন্ত্রকে বেছে নেয়ার জন্য রাজি হলো না; ফলে বাম রাজনীতির সম্ভাবনার ইতি ঘটলো ওখানেই।

জনাব রাশেদ খান মেনন তার প্রবন্ধে এ বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

'পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহারের বিরোধিতায় যে গণসংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠে তা খুব সহজসাধ্য ছিল না। পাকিস্তানের প্রথম যুগে বিরোধী যে কোন আন্দোলনই পাকিস্তান বিরোধিতা ও ইসলাম বিরোধিতা হিসাবে চিহ্নিত হতো।'

এ আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তৎকালীন বাম রাজনৈতিক নেতারা, যারা বর্তমান সময়ের বাম আন্দোলনের নেতা জনাব হাসানুল হক ইনু এবং রাশেদ খান মেননদের রাজনৈতিক গুরু। তারা কিছুতেই দেশটিকে ধর্মের পথে চলতে দেননি। এভাবেই পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকেই যে ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছিল, সেই কলাণের ধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল বাম রাজনীতি।

পৃথিবী ও তার মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু, জীব ও মানুষের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের জন্য কোরআনের মাধ্যমে যে আইন ও নীতিবিধান পাঠালেন সে আইনের চাইতে শ্রেষ্ঠ নীতিবিধান মানুষ কি করে তৈরী করবে? এই বামরা আন্দোলন করে সে নীতি রাষ্ট্রে চালু করতে দিল না। আল্লাহ নিজে যেখানে রাসূল (সা.)কে বিশ্বজগতের রহমত বলে উল্লেখ করেছেন সেই রহমত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে জনগণকে তারা ফেলে দিল সীমাহীন কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে। আজো যে যন্ত্রণা, কষ্ট ও অনিয়মের মধ্যে জনগণকে কালযাপন করতে হচ্ছে। কারণ আল্লাহর নিয়মের বাইরে যে নিয়মই সমাজে চালু করা হোক না কেন, তা নিয়ম নয় বরং অনিয়ম হিসাবেই গ্রাহ্য হবে এবং এ অনিয়ম কখনোই মানুষকে সুখ ও কল্যাণ দিতে পারবে না।

প্রত্যাখ্যাত বাম রাজনীতির শূন্যস্থান পূরণ করলো সুবিধাবাদ

জনগণ বাম রাজনীতির মোহ থেকে মুক্ত হলে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এবার এগিয়ে এল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এরা প্রতিষ্ঠিত করলো আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং আরো পরে আওয়ামী লীগ। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দর্শন যেমন ছিল সুবিধাবাদ, মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা এই রাজনৈতিক নেতারাও তেমনি সুবিধাবাদকেই তাদের রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে

www.pathagar.com

গ্রহণ করলো। ইসলামী আইন সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের সুবিধা গ্রহণের অন্তরায় হওয়ায় পাকিস্তানী শাসকদের মত এরাও শুরুতেই ইসলামকে বর্জন করলো। কিন্তু যেহেতু মানুষকে ধর্মবিমুখ করার অপরাধে মানুষ বাম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তাই তারা মানুষকে ধর্মবিমুখ করার আন্দোলনের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে রাজি হলো না।

তারা এ ক্ষেত্রে নতুন এক দর্শন উপস্থিত করলো, যার নাম দিল ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। জনগণ ইচ্ছে হলে ধর্ম পালন করবে, ইচ্ছে না হলে করবে না। ধর্ম পালন যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। জনগণ দেখলো, বাম রাজনীতির ধর্মকে নাকচ করার ফর্মূলার চাইতে এটা বরং উত্তম। এখানে ধর্মকর্ম করার অন্ততঃ স্বাধীনতা আছে। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য; এর বাইরে তার আর তেমন কোন টার্গেট থাকে না। যেমন পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল মুসলমানদের একটা আলাদা আবাসভূমির জন্য তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হলো পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করার জন্য। ফলে মানুষের ধর্ম নিয়ে ঘাটাঘাটি করার কোন প্রয়োজনীয়তা রইলো না এ আন্দোলনের।

রাশেদ খান মেননদের গুরুরা ধর্মহীনতার যে আন্দোলন শুরু করেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সে পথে পা না বাড়ানোর ফলে তিনি আক্ষেপ করে বলতে বাধ্য হন:

'পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে দৃঢ় ভূমিকা নিতে পেরেছে। কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের প্রশ্নে সে ধরনের দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি। চুয়ান্নর ঐতিহাসিক একুশ দফাতে ধর্মের উল্লেখ ছিল না। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী অথবা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কর্মসূচি ছাত্রসমাজের ১১ দফায় আমরা ধর্মের বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখি না।' (নয়াদিগন্ত ঈদসংখ্যা ২০০৭)।

ধর্মের ব্যাপারে নাক না গলানোর ওয়াদা থাকার জন্যই এসব আন্দোলনে শরীক হতে জনগণের আপত্তি রইলো না। তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাজনীতি থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে যা অর্জিত হলো

এভাবেই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে ধর্মের যথার্থ প্রয়োগ না হওয়ার ফলে ১৯৪৭ সালে যে স্বপ্ন নিয়ে জনগণ স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল তাদের সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত বাংলার জনগণ বাধ্য

www.pathagar.com

হলো আরো একটি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাদের সে সংগ্রামও সফল হলো কিন্তু কাঙ্খিত মুক্তি অর্জিত হলো না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। এর মাঝে বহুবার ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে কিন্তু সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরা নিজেদের সুবিধাটুকু গ্রহণ করলেও জনগণের সুবিধার কথা ভাবার সময় তাদের হয়ে উঠেনি।

কারণ রাজনীতিতে ধর্ম না থাকলে সেখানে থাকে প্রতারণা। রাজনীতি রাজার নীতির পরিবর্তে হয় টাউট-বাটপারের নীতি। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, রাজনীতিতে ধর্মের যথার্থ প্রয়োগ না হলে, খোদাভীরু লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা না দিলে, মানুষের বানানো শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী দেশ না চালালে– জনতার সেই কাঙ্খিত মুক্তি কোন দিনই আসবে না। পাকিস্তানের ২৪ ও বাংলাদেশের ৩৬ মোট ৬০ বছরের রাজনীতির ইতিহাস সে সাক্ষ্যই বহন করছে। এরপরও যদি কোন জাতি সতর্ক না হয় তাহলে দুর্ভাগ্য ক্রমাগত তাদের তাড়িয়ে ফিরবে। এ ব্যাপারে কোরআনের চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে:

'আল্লাহ কখনোই কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না– যতক্ষণ সে জাতি নিজে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে।'

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ কি রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটিয়েছে?

জনাব রাশেদ খান মেনন ঈদ সংখ্যা নয়া দিগন্তে অত্যন্ত অযৌক্তিক ও আপত্তিকর একটি দাবী উত্থাপন করেছেন বলেছেন: *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটায়।'* এই সিদ্ধান্তে তিনি কি করে পৌঁছলেন তা বোধগম্য নয়। বরং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ইতিহাসই তার বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তিনি নিজেই তার উক্ত প্রবন্ধে সে সব ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন:

'চুয়ান্নর ঐতিহাসিক একুশ দফাতে ধর্মের উল্লেখ ছিল না। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী অথবা উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের কর্মসূচি ছাত্রসমাজের ১১ দফায় আমরা ধর্মের বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখি না।'

তার এ বক্তব্য থেকে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে, মানুষের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বরাবরই পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো বিরত ছিল? সুবিধাবাদী মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা আওয়ামী লীগ ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করায় কখনো উৎসাহী ছিল না। তাদের টার্গেট ছিল ক্ষমতার দিকে; ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল নিস্পৃহ।

২. তিনি আরো বলেছেন:

'সে সময়কালের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে, এমনকি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না বলে অঙ্গীকার দেখা যায়।'

তার এ বক্তব্য থেকে এটাই কি প্রমাণিত হয় না, ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে আওয়ামী লীগ যে রাজি নয় জনগণের সামনে সে অঙ্গীকারই তারা করছে? এই অঙ্গীকার কি ধর্মের সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটাবার কথা বলে, নাকি ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না বলে অঙ্গীকার করে? আওয়ামী লীগ যেখানে কোরআন-সুন্নাহর

www.pathagar.com

বিপরীতে কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না বলে ধর্মীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে সেখানে তিনি কি করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটায়?

তার নিশ্চয় জানা থাকার কথা, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ যেমন বামপন্থী প্রভাবিত, পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ছিল তেমনি মুসলিম লীগ প্রভাবিত। এখনকার আওয়ামী লীগের অনেকেই যেমন বাম রাজনীতি থেকে এসেছেন তেমনি পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সবাই এসেছিলেন মুসলিম লীগ থেকে। তাই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে তখন লেখা ছিল: 'কোরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।'

৩. তিনি তার উক্ত প্রবন্ধে মরহুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ টেনেছেন। 'ইসলামী সমাজতন্ত্রম্ব শ্লোগানের মধ্যেই ইসলাম রয়েছে, ইসলামের সাথে সম্পর্কের ইতি টানার প্রসঙ্গ এখানে আসেনি। এখানে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক তৈরীর প্রচেষ্টাই বিদ্যমান, ইতি টানার নয়। তিনি ভাল করেই জানেন, সমাজতন্ত্র থেকে এ দেশের মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিলে মাওলানা ভাসানীর মধ্যস্থতায় ইসলামের সাথে সহাবস্থানের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র এভাবে বরং নিজের আত্মরক্ষার পথ তৈরী করেছিল।

৪. মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগের এ ইতিহাস রেখে এবার সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের দলীলপত্রের দিকে নজর দেয়া যাক। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল হিসাবে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে কখনোই রাজি হয়নি আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের ছয় দফায় সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার যেমন উল্লেখ ছিল না তেমনি ছাত্র সমাজের ১১ দফায়ও সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষার উল্লেখ ছিল না। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো বা গঠনতন্ত্রেও সরাসরি সমাজতন্ত্র বা ধর্মবিমুখ ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ ছিল না বরং *'কোরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না'* বলে জনগণকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়া যখন 'স্বাধীনতা ঘোষণা' করেন তখনও সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে স্বাধীনতার ডাক দেননি। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের সময় যে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় তাতেও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষার কোন উল্লেখ ছিল না। তাহলে কোন যুক্তিতে এবং কিসের ভিত্তিতে তিনি বলেন, *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটিয়েছে?'*

৫. তার অভিযোগ, যেহেতু পাকিস্তানী শাসকরা ধর্মের নামে হত্যা, ধর্ষণ ও অত্যাচার নির্যাতন করেছিল তাই আমাদের জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দিতে হবে।

www.pathagar.com

ধর্মের নামে কেউ কিছু করলে সে জন্য ধর্মকে বাদ দিতে হবে এটি এক হাস্যকর দাবী। চোরও চুরি করার সময় আল্লাহকে ডাকে যাতে সে ধরা না পড়ে। তাই বলে তার চুরির দায় কখনো ধর্মের ঘাড়ে তুলে দেয়া যায় না। তার দাবী মতে পাকিস্তানীদের ধর্ম ব্যবহারের কারণে যদি ধর্মকে বাদ দিতে হয় তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্ম ব্যবহারের কারণে কি করতে হবে? নিশ্চয়ই ধর্মকে বুকে আকড়ে ধরতে হবে? তিনি কি অস্বীকার করবেন, প্রতিটি অপারেশনে যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতো?

মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দুর্দিনে আল্লাহ ছাড়া এ দেশের মানুষের আর কোন সহায় ছিল না। বিপদে আপদে সাড়ে নয় মাসের প্রতিটি মুহূর্ত এ দেশের মানুষ পার করেছে আল্লাহ আল্লাহ বলে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন রোযা রেখে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, ঘরের নিভৃত কোণে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এ প্রার্থনা ছিল আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও হৃদয় নিংড়ানো।

এ দেশের মানুষ যেমন ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র চায়নি, তেমনি ধর্মকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতাও চায়নি। তারা স্বাধীনতা চেয়েছিল বুকে ধর্মকে ধারন করেই। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও এ কথা ভাল করেই বুঝতেন। তাই তারা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ধর্মকে ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি। ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন অনুষ্ঠানের বিবরণী পাঠ করুন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূরুল কাদির তার *'দুশো ছিষট্টি দিনে স্বাধীনতা'* গ্রন্থে সেই বিবরণী তুলে ধরেছেন এভাবে:

'প্রথমেই সাদা টুপী, চেক লুঙ্গি ও সাদা জামা পরে স্থানীয় মৌলানা সাহেব পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করে সভার শুভ উদ্বোধন করলেন। ... নেতৃবৃন্দের সকলের পরনে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবী। একমাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পরনে গাঢ় ছাই রঙএর লম্বা কোটপ্যান্ট আর টুপি।'

লক্ষ্য করুন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ধর্মকে বাদ দিয়ে শুরু হয়নি এমনকি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা (যা আপনাদের চোখে ধর্মহীনতা এবং আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগের চোখে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকা) অবলম্বন করে গীতা, বাইবেলসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেও শুরু হয়নি। অতএব দেখা যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে বা মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল না; বরং বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি প্রমাণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখনো ছিল ইসলাম; যে কারণে একমাত্র পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করে সভার শুভ

www.pathagar.com

উদ্বোধন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে ধর্মকে ব্যবহার করার এমন অজস্র দৃষ্টান্ত স্বাধীনতার দলীলপত্রে ছড়িয়ে আছে, এ দেশের জনগণেরও তা অজানা নয়। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তার থেকে আর মাত্র একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

ইসলাম ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। এ কেন্দ্রের কার্যক্রমের যে বিবরণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থে লেখা হয়েছে তার কিছু অংশ:

'মুক্তিযুদ্ধ যে ইসলাম বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করার জন্য 'ইসলামের দৃষ্টিতে' নামে ধারাবাহিকভাবে কথিকা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।.. অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের মাহাত্মে খুবই মুনশিয়ানার সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ইসলামকে সকলের কাছে যথার্থরূপে তুলে ধরেছিলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের সেই ধারাবাহিক 'ইসলামের দৃষ্টিতে' কথিকা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত সময়োপযোগী ও উপকারী হয়েছিল। বাংলাদেশের ভিতরে ও বাইরে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সেই কথিকাগুলো প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতের বাঙালি মুসলমানগণের মধ্যে প্রথম থেকেই যে ভুল দানা বেধে উঠেছিল, সেইসব ভুল ভাঙতে ঐ কথিকাগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।' (মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূরুল কাদের: দুশো ছিষট্টি দিনে স্বাধীনতা)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে 'ইসলামের দৃষ্টিতে' অনুষ্ঠানে যেসব কথিকা পঠিত হতো সেগুলো ছিল এরকম:

(১) ইসলাম ও গণতন্ত্র (২) ইসলাম ও মানবতা (৩) ইসলামে নরহত্যা (৪) ইসলামে জেহাদ (৫) ধর্মের নামে ধোকাবাজি (৬) বিশ্বাসঘাতকতা ও ইসলাম (৭) সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি ও ইসলাম ইত্যাদি।

এই চেতনা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়? এরপরও কি এ কথা বলা সঙ্গত হবে, মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের ব্যবহার হয়নি? তাহলে কি আমরা বলতে পারি না, *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটায়'* কথাটি সত্যের অপলাপ ও নির্জলা মিথ্যা মাত্র।

www.pathagar.com

৬. বাংলাদেশের যেটুকু অর্জন তা এ দেশের জনগণের ইসলাম সম্পৃক্ততার কারণেই সম্ভব হয়েছে আর যেটুকু ব্যর্থতা তার জন্য দায়ী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কারণ বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র এখন একটি পতনশীল আদর্শ। এ মুহূর্তে যারা তার নিচে দাঁড়াবে সমাজতন্ত্রের প্রাসাদ তাদের মাথার ওপরই ভেঙে পড়বে এবং তাতে করে সমাজতন্ত্রের ধারকরা হয় মৃত্যুবরণ করবে নয়তো তার নিচে চাপা পড়ে কাৎরাবে।

সমাজতন্ত্রীদের পরামর্শে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হলেও এ জন্যই আওয়ামী লীগ তা কোনদিন বাস্তবায়ন করেনি; যার ফলে এখনো এ দেশটি টিকে আছে। সংবিধানের মাথায় সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লাগানোর কারণ যে বামপন্থীদের শান্তনাদানের প্রচেষ্টামাত্র ছিল আশা করি বাম নেতারা এতদিনে তা বুঝতে পেরেছেন। আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাদের শাসনামলে বা বাংলাদেশের ৩৬ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থী ভাবাদর্শ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন না করা থেকেই এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ দেশের আবহাওয়া উপযোগী কোন আদর্শ নয়। এ দেশের গণমানুষের হৃদয় জয় করার মত কোন আকর্ষণ এসব মতবাদের নেই।

যে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটিয়েছে বলে দাবী করেছেন সে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা কি এ দেশে একদিনের জন্যও কায়েম হয়েছিল? কাগুজে বাঘ ভয় দেখাতে পারে কিন্তু সে কাউকে গিলে ফেলতে পারে না। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের কাগুজে বাঘ; ইসলামকে খেয়ে ফেলার সাধ্য আজ অবধি তার হয়নি এবং আর কোনদিন হবেও না। আমার এ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য জনাব রাশেদ খান মেননের আক্ষেপভরা উক্তিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন:

'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হলো তারাও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের সমস্যার মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে বরং অতীতের শাসকগোষ্ঠীর মতোই ধর্মের মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজতে থাকেন। এ কারণেই দেখা যায় যে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংযোজিত হলেও শাসকগোষ্ঠীর কাছে তার ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা না হয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষতা হিসাবে দাঁড়ায়।' (নয়াদিগন্ত ঈদসংখ্যা ২০০৭)। জনাব রাশেদ খান মেননের জন্য এটা কষ্টকর হলেও বাংলাদেশের রাজনীতির এটাই চূড়ান্ত বাস্তবতা। তার আক্ষেপের আরও কারণ হচ্ছে, পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিব

www.pathagar.com

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেই টের পেলেন সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য রেসকোর্সে তার সম্বর্ধনা সভাতেই বাংলাদেশকে বিশ্বের 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ' হিসাবে ঘোষণা করলেন এবং তাদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সম্মেলনে যোগদান করলেন। তার ভাষ্যমতে:

'মুসলিম বিশ্বের পশ্চাদপদ দেশগুলোর সমর্থন আদায় করতে গিয়ে বাংলাদেশ তার অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রসত্তার চরিত্র ছেড়ে নিজেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করতেই অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচ্য ডলারের আকর্ষণও এ ক্ষেত্রে অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে কাজ করে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রভিত্তি থেকে যে স্খলন ঘটা শুরু হয়, তাই এখন বাংলাদেশকে একটি ধর্মবাদী রাষ্ট্রের পরিচয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'[১] (ঐ)।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই, সেদিন যদি বামদের কথা শুনে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হতো তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারাটা আজ কেমন থাকতো? মধ্যপ্রাচ্যসহ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে যে বিপুলসংখ্যক জনশক্তি রফতানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতি তার মেরুদন্ড এখনো সোজা করে রেখেছে বামদের কথা শুনলে তা কি কোনদিন সম্ভব হতো? আমি যে বলেছি, বাংলাদেশের যেটুকু অর্জন তা এ দেশের জনগণের ইসলাম সম্পৃক্ততার কারণেই সম্ভব হয়েছে আর যেটুকু ব্যর্থতা তার জন্য দায়ী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এ থেকে তাই কি আবারো প্রমাণিত হয় না?

এ দেশের জনগণ যে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে কোনদিন আপন করে নিতে পারেনি বরং ইসলামই তাদের প্রাণের স্পন্দন তার প্রমাণ ১৯৭৪ সালে যখন এ দেশে কোন ইসলামী রাজনৈতিক দল ছিল না তখন দাউদ হায়দার কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে গালি দেয়ার অপরাধে জনগণের রাস্তায় নেমে আসা। যে গণবিক্ষোভের মুখে শেখ মুজিব দাউদ হায়দারকে দেশান্তরিত করতে বাধ্য হন সে গণবিক্ষোভই প্রমাণ করে, ইসলামের সাথে এ দেশের মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড় ও আন্তরিক। এ আন্তরিকতাই এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের রক্ষাকবচ। রাশেদ খান মেনন যতই বলুন: 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটায়' তা তার কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতার পূর্বাপর ইতিহাস প্রমাণ করে তার এ উক্তি কেবল সত্যের অপলাপই নয় নির্জলা মিথ্যাও। তাই পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই বলা যায়, ইসলামের বিরুদ্ধে যত রকম ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, কোন ষড়যন্ত্রকেই সফল হতে দেবে না এ দেশের জনগণ।

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম ও সমাজতন্ত্র

জনাব রাশেদ খান মেনন ও তার সহযোদ্ধারা গোয়েবলসীয় পন্থায় একটি মিথ্যাকে সমস্বরে হাজার লক্ষ বার উচ্চারণ করে তাকে সত্য বলে প্রচার করার সেই চিরাচরিত পথটিই বেছে নিয়েছেন ইসলামের বিরুদ্ধে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ধর্ম, ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। যখন পাকিস্তান হয়নি তখনো তারা ইসলামের বিরোধিতা করেছে, পাকিস্তানের ২৪ বছরও তাদের সমস্বর কোরাস ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে, এখনো তাই চলছে। এখন তারা বলছেন, ইসলামপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল, তাই ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। তাহলে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, যখন এ দেশে রাজাকার-আলবদরের জন্ম হয়নি, যখন এ দেশে স্বাধীনতার ডাক আসেনি, তখন কেন তারা ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন? করেছিলেন এ জন্য যে, ব্যর্থ সমাজতন্ত্র তাদের শিখিয়েছিল ধর্মের বিরোধিতা করতে।

সমাজতন্ত্রের নেতা ও কর্মী হিসাবে সে দায়িত্ব তারা সেদিনও পালন করেছেন, আজো করছেন। আর এই বিরোধিতা করতে গিয়ে মিথ্যাচার করা তাদের কাছে রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। এই কৌশল প্রয়োগে তারা কখনো দুর্বলতার পরিচয় দেননি। লক্ষ্য অর্জনে কৌশলের নামে মিথ্যাচারকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তারা একই কথা শত মুখে বার বার বলতে থাকেন। প্রথম বার বিশ্বাসযোগ্য না হলেও শুনতে শুনতে এক সময় যেন জনগণ তা সত্য বলে মানতে বাধ্য হয়। রাশেদ খান মেনন সম্প্রতি নয়া দিগন্ত ঈদ সংখ্যায় বলেছেন:

'মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মকে ব্যবহার করে যে হত্যা-ধর্ষণ, লুণ্ঠনের ঘটনা পরিচালনা করা হয়, তার হোতারাও রাষ্ট্র ও সমাজে পুনর্বাসিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে মুক্তিদান বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। ধর্মের নামে যুদ্ধাপরাধী এই ব্যক্তিরাই পরে বাংলাদেশের অংশীদার হয়েছে।'

www.pathagar.com

বিগত ৩৬ বছর ধরে তারা এই অভিযোগগুলো করে আসছেন এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দরা এ দেশে ধর্মকে ব্যবহার করে হত্যা-ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটিয়েছে। কথাটি যে সত্যের কত বড় অপলাপ জনগণ তা ভাল করেই জানে।

শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে হত্যা-ধর্ষণ, লুণ্ঠনের সাথে জড়িত কাউকে ক্ষমা করা হয়নি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকে সেই পার্থক্যের কারণে যারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে পারেনি এবং রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করেছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা যেন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে শরীক হতে পারে তার জন্যই ছিল এ সাধারণ ক্ষমা। কিন্তু সে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা ছিল; হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের সাথে জড়িত কেউ এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়বে না। এ ধরনের অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণাও এতে ছিল।

ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা হত্যা-ধর্ষণ, লুণ্ঠনের সাথে জড়িত থাকলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার অধিকার সবসময় ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু বিগত ৩৬ বছর ধরে যারা এ অভিযোগগুলো করে আসছেন তারা কি ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত একটি মামলাও দায়ের করে তা প্রমাণ করতে পেরেছেন? ইসলামী আন্দোলনের কোন নেতা-কর্মী যদি খুনি, ধর্ষক বা লুণ্ঠনকারী হয়ে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে তারা আদালতের আশ্রয় নেন না কেন? খুনি, ধর্ষক ও লুণ্ঠনকারীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ক্ষমতা আমাদের আদালতের আগেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু বিগত ৩৬ বছরে এ ধরনের একটি দৃষ্টান্তও আদালতে প্রমাণিত না হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয়, এসব অভিযোগ স্রেফ মিথ্যা, বানোয়াট এবং একান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আমাদের দেশের আলেম ওলামা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা খুন, রাহাজানি ও ধর্ষণের সাথে কি পরিমাণ জড়িত আর তথাকথিত প্রগতিশীল বিপ্লবী নেতা-কর্মীরা কতটা জড়িত এ দেশের মানুষ তা ভাল করে জানে বলেই বিভিন্ন দুতাবাসের সহযোগিতা এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য সত্ত্বেও এ দেশে তাদের জনসমর্থন কখনো দুই পার্সেন্ট অতিক্রম করতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের নেতারা এটা জানেন বলেই তাদের ক্রমাগত মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে সমাজে তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলতে চাননি। বরং ইসলামী আন্দোলন সেই দিনের অপেক্ষা করছে, যেদিন

www.pathagar.com

জনগণ এই দুই পার্সেন্ট সমর্থনও প্রত্যাহার করে এই মিথ্যাচারের জবাব দেবে। তিনি অভিযোগ করেছেন:

'ধর্মের নামে যুদ্ধাপরাধী এই ব্যক্তিরাই পরে বাংলাদেশের অংশীদার হয়েছে।'

কিভাবে হয়েছ? তারা কি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ক্ষমতায় বসেছেন? সবাই জানেন, কোন অবৈধ পন্থায় ইসলাম পন্থীরা ক্ষমতায় আরোহণ করেননি, বরং জনগণই তাদের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে তাদের ক্ষমতার অংশীদার করেছে। তাদের গাত্রদাহের কারণ, তাদের ক্রমাগত মিথ্যাচারের পরও জনগণের সেই আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসায় চিড় ধরার মত কোন ঘটনা ঘটেনি আর সে জন্য সেই বিশ্বাস ও ভালবাসা উত্তরোত্তর আরো জোরালো হচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র

ইসলামী চরিত্রের লোক ছাড়া যেমন ইসলাম কায়েম হয় না তেমনি সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী কর্মী ছাড়াও সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব নয় এ কথাটি বুঝতে না পারার দরুণ বাহাত্তুরের সংবিধানে সমাজতন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে বাম নেতারা ভেবেছিলেন এ দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেছে। অবশ্য এতদিনে তাদের সে ভুল ভেঙ্গেছে। এ অপকর্মটি করার ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে রাশেদ খান মেনন নিজেই তা বর্ণনা করেছেন তার নয়া দিগন্তের প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন:

'সমাজতন্ত্রের অপপ্রয়োগে এক ধরনের অবাধ লুটপাটতন্ত্রের জন্ম দেয়া হয়েছিল। এই লুটপাটতন্ত্রই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পুরনো কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন শাসনামলে বর্ধিত হয়ে এখন অর্থনৈতিক মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিদেশী দাতা গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট এই লুটপাটতন্ত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনবৈষম্য, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে। ... বাংলাদেশের অর্থনীতির এই অবস্থার পাশাপাশি কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলনের কার্যত অনুপস্থিতি, শ্রমিক আন্দোলনের অধঃপতিত অবস্থা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসারের বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরী করেছে।'

জনাব রাশেদ খান মেননের এই স্বীকারোক্তি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাংলাদেশে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতির এই যে বিস্তার, যার কারণে দেশ আজ এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন, এর জন্য দায়ী সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের নামেই এ দেশে অবাধ লুটপাটতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। এই লুটপাটতন্ত্রই বিভিন্ন শাসনামলে বর্ধিত হয়ে এখন অর্থনৈতিক মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিদেশী দাতা গোষ্ঠীর

www.pathagar.com

সমর্থনপুষ্ট এই লুটপাটতন্ত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনবৈষম্য, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দারিদ্রের জন্য দায়ী সমাজতন্ত্র; কর্মহীনতার জন্য দায়ী সমাজতন্ত্র, ধনী-গরীবের ধনবৈষম্যের জন্য দায়ী সমাজতন্ত্র, গ্রাম ও শহরের বৈষম্যের জন্যও দায়ী সমাজতন্ত্র। আমাদের সব অভাব ও দুঃখকষ্টের জন্যই এ সমাজতন্ত্র দায়ী।

শুধু তাই নয়, এই সমাজতন্ত্রই রাজনীতিতে স্বার্থপরতার বিস্তৃতি ঘটিয়েছে, জন্ম দিয়েছে অবাধ লুটপাটতন্ত্রের। বিভিন্ন শাসনামলে বর্ধিত হয়ে এখন যা অর্থনৈতিক মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং রাজনীতিতে অর্থ ও পেশী শক্তির ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রবণতাও রাজনীতিবিদরা লাভ করেছেন এখান থেকেই। সমাজতন্ত্রের নাম ব্যবহার করেই আমাদের রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করে সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য লোভাতুর হয়েছিলেন; যার মর্মান্তিক পরিণতি এখন রাজনীতিবিদদের সাথে সাথে জনগণও ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই অনাচারের ফলে দেশ থেকে আজ গণতন্ত্র নির্বাসিত। গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য এখন লড়াই করতে হচ্ছে একটি অনির্বাচিত সরকারকে। এসব কিছুর জন্য তথাকথিত সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে দায়ী করা ছাড়া জনগণ আর কাউকেই দায়ী করতে পারছে না।

যে সমাজতন্ত্র আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই ১১ জানুয়ারীর পটপরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে জনগণ। যেদিন জনগণ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন, প্রতারক রাজনীতিবিদদের খপ্পড় থেকে বেরিয়ে সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে এ দেশের শাসনভার তুলে দিতে পারবে সেদিন থেকেই নতুন করে যাত্রা শুরু হবে উন্নতি ও অগ্রগতির। জনাব রাশেদ খান মেননের মতে, 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রসারের বিস্তৃত যে ক্ষেত্রটি তৈরী হয়েছে' সেখান থেকেই বেরিয়ে আসবে সৎ ও যোগ্য শাসক।

সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলাম

আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কি করে সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মকে দায়ী করেন আমার বুঝে আসে না। সম্প্রদায় থেকে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায়; ধর্ম থেকে বিস্তার ঘটে ধার্মিকতার। জেলে সম্প্রদায়, গারো সম্প্রদায়, বেদে সম্প্রদায়ের মত মুসলমানরাও কি করে তাদের চোখে নিছক একটি সম্প্রদায় হয় ভাবতে অবাক লাগে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান কোন সম্প্রদায় নয়; বরং জাতি হিসাবেই এদের পরিচিতি। তাই সাম্প্রদায়িকতার দায় এদের ঘাড়ে চাপানো মুর্খামী। তবু

www.pathagar.com

যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি, সাম্প্রদায়িকতা বলতে তিনি ধর্মীয় সংঘাতকেই বুঝিয়েছেন এবং সে সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত; তাই তাকে আশ্বস্ত করা আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে।

তিনি উক্ত প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ টেনে এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য মূলতঃ ইসলামকেই দায়ী করেছেন। অথচ ইসলামে সাম্প্রদায়িকতা নেই এবং ইসলাম থেকে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব নয়। ইসলাম কেবল মুসলমানদের জন্য আসেনি, এসেছে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দল বা জাতির কল্যাণ নয়, মানবতা ও সভ্যতার কল্যাণের জন্যই রচিত হয়েছে আল্লাহর বিধান। যারা আল্লাহর বিরোধিতা করে তাদেরও আহার যোগান তিনি। ইসলামের মূল বাণী হচ্ছে প্রেম ও ভালবাসা। আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসার যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে সেই ভালবাসাই আমাদের শিখিয়েছেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)। আর এ জন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন, অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের রহমত।

বাংলাদেশের মুসলমানরা রাসূলের এ শিক্ষার কথা জানে এবং মানে। এ জন্যই ধর্মীয় সংঘাত এ দেশে বিরল ঘটনা। এ দেশের মুসলমান ও হিন্দুরা প্রায় একই সময় ঈদ ও দুর্গা পূজা উদযাপন করে এবং আনন্দের জোয়ারে ভাসে। এই সম্প্রীতি বিশ্ব সম্প্রদায় মুগ্ধ নয়নে প্রত্যক্ষ করে প্রীত হয়। এ দেশের সংখ্যালঘু অমুসলমানরা কখনো সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় সংঘাতের ভয়ে ভীত হয়নি এবং এ নিয়ে তারা কখনো অভিযোগও তোলেনি। এ অভিযোগ তোলেন আমাদের বাম নেতা রাশেদ খান মেনন, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা শাহরিয়ার কবির ও তাদের সঙ্গীরা। তাদের এ ভূমিকা, দরদ ও মায়াকান্নার মর্ম তুলে ধরার জন্যই বাংলাভাষায় একটি প্রবাদ তৈরী হয়েছে– যাকে বলা হয়, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। এ ধরনের কপট প্রেমিকদের কোন কালেই মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যোগ্য মনে করে না।

ধার্মিকতা বনাম বকধার্মিকতা

ধর্মীয় রাজনীতির কল্যাণকর ধারাটি বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে যখন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও আস্থাহীন মানুষ ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষকে ধোঁকা ও প্রতারণা করেছে। যখন বকধার্মিকরা ধার্মিক সেজে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের এই অপব্যাবহার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাশেদ খান মেনন অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই বকধার্মিকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। চমকপ্রদ তথ্য প্রদান করে তিনি বলেছেন:

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের এই ব্যবহার কেবল ধর্মভিত্তিক দলগুলোর

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দলগুলোর মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছে। দেশের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (মো) সমাজতন্ত্রের সাথে দলীয় নীতিতে ধর্মকে যুক্ত করেন। কেবল তাই নয়, অধ্যাপক মোজাফফর নিজেকে গ্রহণযোগ্য করতে মাথায় টুপীও চড়ান। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মৃত্যুর পর পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবে নয়, দলীয় অনুষ্ঠান হিসাবে ধর্মীয় কৃত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। আর দেশের সর্ববৃহৎ ও দলীয় নীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকদের থেকে বিশেষ কিছু ফারাক দেখা যায় না। দলের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাদ দেয়ার দাবীও বিভিন্ন সময়ে উঠেছে আওয়ামী লীগে।'

নির্বাচনের সময় হেজাব পরিধান এবং নির্বাচনী শ্লোগান *'নৌকার মালিক তুই আল্লাহ'* বলা বা মাওলানা আজিজুল হকের মত কট্টর ইসলাম পন্থীদের সাথে নির্বাচনী আঁতাত এসবই মূলতঃ ধর্মের অপব্যবহার। রাজনীতিতে ধর্মের সুফল পেতে হলে ধর্মের এই অপব্যবহার বন্ধ করে ধর্মের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কেবল ধর্মীয় রাজনীতির বিকাশ ও বিস্তৃতির মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। যেদিন আমরা ইসলামকে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ ও বাস্তব জীবনে পালন করতে পারবো কেবল সেদিনই কল্যাণের উৎসধারা আমাদেরকে স্পর্শ করবে।

ধর্ম কাউকে লিজ দেয়া হয়নি

এতোক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে এটা স্পষ্ট যে, বিগত ৬০ বছর ধরে রাজনীতি থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা থেকেই রাজনীতিতে এসেছে সব রকমের অনাচার ও দুর্বৃত্তায়ন। আল্লাহ ভয়, পরকালের ভয় এবং পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয় না থাকার ফলে সম্ভব হয়েছে দুর্নীতির সীমাহীন বিস্তার। রাজনীতিতে এসব অনাচার ও দুর্বৃত্তায়নের বিস্তৃতি ঘটার অনিবার্য পরিণতিতে দেশ আজ গণতন্ত্রহীন। ধর্মীয় রাজনীতির বিকাশ ও বিস্তৃতির মাধ্যমেই এ অবস্থার উত্তরণ ঘটা সম্ভব। রাশেদ খান মেনন ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে ইসলামের অনুসারী। তিনি যদি মনে করেন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতিতে ধর্মের যথার্থ অনুসরণ হচ্ছে না তাহলে তা করার দায়িত্ব তার।

এ দেশের জনগণ বুঝতে পেরেছে, রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করলে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি করতে সুবিধা হয়, তাই রাজনীতিবিদরা ধর্মের পথে যেতে চান না। কিন্তু জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ধর্মীয় রাজনীতির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ নয় বরং ধর্মীয় রাজনীতিকে অগ্রসর করার

www.pathagar.com

মধ্যেই জাতির কল্যাণ। এই কল্যাণের পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকে ধর্ম লিজ দেয়া হয়নি। ধর্ম আমাদের সবার। আমরা যে যে ধর্মেই অবস্থান করি না কেন, তার চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণ করতে পারি।

রজনীতিতে ধর্মের সঠিক ব্যবহারের কারণে আমরা যেমন দুশো বছরের গোলামী মুক্ত হতে পেরেছিলাম; যার ফলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামে নতুন এক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল সেই ইসলামকে ধারণ করলেই আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারবো। মুসলমান হিসাবে আমরা জানি, সর্বমানবের কল্যাণের জন্যই এসেছে ইসলাম। তাই কোন ব্যক্তি বা দলের ইচ্ছা আকাঙ্খা নয়, আল্লাহর শাসন ও কোরআনের আইনই হতে পারে মানুষের সার্বিক মুক্তির একমাত্র হাতিয়ার।

www.pathagar.com

জহির রায়হানের খুনি কে বা কারা?

মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির ১৯৭১ সালে ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুলতানা শাহরিয়ার কাদির লালী ছিলেন ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা। ৮ই মার্চ 'দৈনিক পাকিস্তানে' কালো চাদর গায়ে, লাঠি হাতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে বাড়ি ফেরার দৃশ্য সম্বলিত যে মহিলার ছবি ছাপা হয়, সেটি ছিল সুলতানা শাহরিয়ার কাদির লালীর।

আওয়ামী লীগের সদর দপ্তর দিলকুশা ইউনিয়নে থাকায় মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির কেন্দ্রীয় নেতাদের খুব কাছাকাছি ছিলেন এবং তাঁর দায়িত্ব অন্যান্য ইউনিয়ন নেতাদের চাইতে অনেক বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নগর আওয়ামী লীগের সদস্য থাকায় রাজধানী ঢাকার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি শুধু অবহিতই থাকতেন না অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করতেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার বিকাল চারটার দিকে তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যান। সন্ধ্যার কিছু আগে 'রাতে আর্মি মুভ করতে পারে' এমন একটা আভাস পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তাকে আদেশ দেন ঢাকার সব কয়টা ইউনিয়ন ঘুরে, ইউনিয়ন নেতাদের নিকট সকল রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করার নির্দেশ পৌঁছে দিতে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দেশ পালনের জন্য শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন এখনকার মত মোবাইলের যুগ ছিল না। ফলে সারা শহর ঘুরে ঘুরে তাকে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে হচ্ছিল। এ খবর দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে যায় এবং তিনি বাড়ি ফেরার আগেই পাক বাহিনীর অপারেশন শুরু হয়ে যায়। তারপর তিনি কিভাবে বাড়ি ফিরলেন, কিভাবে মেজর জিয়ার ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে ঘর ছাড়লেন এবং কিভাবে পাক বাহিনীকে বোকা বানিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে পৌঁছলেন সেসব বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 'দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা' গ্রন্থে।

তিনি বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা রাখার জন্য জাতিসংঘ যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ঘর থেকে বের হলেও কোলকাতায় যাওয়ার পর সেখানে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

নেতাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীসহ ভারতের নেতাদের সাথে বৈঠকাদি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন।

পরে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তৎকালীন মন্ত্রীপরিষদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের চীফহুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ অনেকেরই আস্থাভাজন থাকায় তাকে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। এই সুবাদে তিনি ইরান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। তিনি সে সময় মুজিবনগর সরকারের 'স্পোকসম্যান' হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি তাঁর 'দুশো ছিষট্টি দিনে স্বাধীনতা' গ্রন্থের নবম সংস্করণের বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ' নামে যে সংগঠনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ.আর. মল্লিককে (সাবেকমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত) সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাহিত্যিক জনাব জহির রায়হান। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারী তিনি মিরপুরের বধ্যভূমি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবদুল কাদির তাঁর মৃত্যুরহস্য নিয়ে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। এ প্রশ্নের মধ্যে স্বাধীনতার অনেক গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পুরোটাই এখানে তুলে ধরছি।

'জহির রায়হান

একাত্তরে জহির রায়হান যে আন্তর্জাতিক মানের 'স্টপ জেনোসাইড' নামে বিখ্যাত অমর চলচ্চিত্রটি বানিয়েছিলেন, সেই ছবিটি ১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, কেবলমাত্র ঐ একটি অমর চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্যেই জহির রায়হানের নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জহির রায়হানের অন্যান্য অমর সৃষ্টি হচ্ছে– 'জীবন থেকে নেয়া', 'লেট দেয়ার বি লাইট', 'এস্টেট ইজ বর্ণ', 'কখনও আসেনি' ইত্যাদি।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ স্বাধীনতা লাভের পর পরই জহির রায়হান ঢাকায় ফিরে তাঁর বড় ভাই প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার (প্রজন্ম '৭১-এর নেত্রী ও প্রখ্যাত টিভি নায়িকা শমী কায়সারের বাবা) মিরপুরে কোন এক গোপন আস্তানায় বন্দী হয়ে আছেন, এমন একটা উড়ো খবর পেয়ে, তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে খুবই রহস্যজনকভাবে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭২ মিরপুর থেকে চিরতরে

www.pathagar.com

হারিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবতে খুবই অবাক লাগে, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে কত 'জনপ্রিয়' সরকার এলেন ও গেলেন, কিন্তু কোন সরকারই বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক ও সাহিত্যিক জহির রায়হান কেন ওভাবে হঠাৎ অকালে রহস্যজনকভাবে মিরপুর থেকে স্বাধীনতার পর পরই 'হারিয়ে' গেলেন, সেই রহস্য উদঘাটন করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেন না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় "বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ"-এর সবচেয়ে সক্রিয় নেতা ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জহির রায়হান। সেই প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রায় সকল স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী সদস্য থাকা সত্ত্বেও, কই তাঁরাও তো গত ২৫ বছরে চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলার ন্যায় কেবলমাত্র সভা-সমিতিতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঝড় তোলা ছাড়া, জহির রায়হান যে রহস্যজনকভাবে মিরপুর থেকে স্বাধীনতার পর পরই চিরতরে হারিয়ে গেলেন সেই ব্যাপারে তেমন কিছু করলেন না?

স্বাভাবিক কারণেই মনে প্রশ্ন জাগে, ঐ জঘন্যতম অপরাধ কারা করেছিল? কেন করেছিল? নিশ্চয়ই অপরাধীবৃন্দ প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেই অপারেশনে নেমেছিল। আর তাই যদি না হবে, তাহলে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত থেকে লাখ লাখ মানুষ ও হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী ফেরৎ এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই, হয়তো বা মিরপুরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কই তাদের মধ্যে অন্য কারো ভাগ্যে তো ঐ রকম সাংঘাতিক কিছু ঘটলো না? তাহলে কি জহির রায়হানকে মিরপুর থেকে হারিয়ে যেতে বাধ্য করার পেছনে এমন কোন কারণ ছিল যা দেশবাসীর আজো অজানা রয়ে গিয়েছে?

অনেকে বলে থাকেন যে, একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জহির রায়হান হয়তো বা তার মুভি ক্যামেরা নিয়ে এখানে ওখানে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর সময়, এমন কোন ঘটনার ছবি তার ক্যামেরায় বন্দী করেছিলেন, যার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই স্বাধীনতার পর পরই তাঁর সবচেয়ে দুর্বল স্থান, বড়ভাই-এর কথা বলে, তাঁকে কৌশলে মিরপুরে ডেকে নিয়ে যেয়ে চিরতরে হারিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই অভিযোগ কতটুকু সত্য বা সবটুকুই মিথ্যা কি-না তা আমার জানা নেই। হতে পারে এ সবই অনুমান।

আবার অন্যেরা বলে থাকেন যে, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া হয় যে, স্বাধীনতার পর পরই জিঘাংসা মিটানোর জন্যেই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ঐ জঘন্যতম ঘৃণ্য অপরাধটি করেছিল, তাহলেও মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক– স্বাধীনতার পর পরই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যখন নিজেরাই নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে হন্যে হয়ে লুকানোর মতন উপযুক্ত নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন তাদের পক্ষে কি জহির রায়হানের ন্যায় এক মহান ব্যক্তিত্বকে মিরপুরে ডেকে এনে

www.pathagar.com

'গায়েব' করে দেওয়ার মতন জঘন্য অপরাধটি করা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবও আমার জানা নেই।

কেন এবং কারা জহির রায়হানকে স্বাধীনতার পর পরই মিরপুরে ডেকে এনে চিরতরে 'হারিয়ে' বাধ্য করেছিল, তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত বলে নিশ্চয়ই সকলেই আশা করেন। দেশবাসী কি আশা করতে পারেন যে, 'প্রজন্ম '৭১'-এর বীরযোদ্ধারা এবং বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সরকার সেই রহস্য উদঘাটন করে অসাধ্য সাধন করবেন?'

মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের বইটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৯৭ সালে। তখন ক্ষমতায় ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকার। তাঁর এ দাবী উত্থাপনের পরও কেটে গেছে প্রায় এক যুগ এবং জহির রায়হানের অন্তর্ধানের পর তিনটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সরকারই কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? তবে কি যে কথা শোনা যায়, একাত্তুরে আওয়ামী লীগের নেতারা কোলকাতার হোটেলে যেসব অপকর্ম করেছিলেন তিনি সেসব অপকর্মের অনেক চিত্রই তার ক্যামেরাবন্দী করতে পেরেছিলেন, সেসব ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই কি আওয়ামী লীগ নেতারা বিজয়ের দেড় মাস পর তাঁকে বধ্যভূমিতে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছিলেন?

আজ (৯ডিসেম্বর ২০০৭ সন্ধ্যা ৭টা) যখন এ লেখাটি লিখছি তার ঘন্টাখানেক আগে নামীদামী এক জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকের টেবিলে একাত্তরের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। প্রসঙ্গত তিনি জানালেন, জহির রায়হান ছিলেন তার বাল্যবন্ধু এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ১৯৭০ সালে তিনি ও জহির রায়হান মিলে একটি ইংরেজি কাগজ বের করেছিলেন এবং নয় মাস পত্রিকাটি বেঁচে ছিল। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে তিনি লন্ডন এবং জহির রায়হান কোলকাতা পাড়ি জমালে পত্রিকাটির মৃত্যু ঘটে।

জহির রায়হানের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি আরো চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, জহির রায়হান নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত অবস্থায় মিরপুর যাননি। তিনি তখন দিলু রোডে থাকতেন। বাসা থেকে বেরিয়ে প্রথমে তিনি যান রমনা থানায় এবং তাঁর ভাইকে উদ্ধার করার ব্যাপারে পুলিশের সহায়তা চান। তখন তার গাড়ির সাথে এক গাড়ি পুলিশ পাঠানো হয়। পুলিশসহ তিনি মিরপুর বধ্যভূমির কাছে পৌঁছলে সেখানে পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা জবাব দেয় কিন্তু সন্ত্রাসীদের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা থানায় ফিরে আসে। পরে আরো পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে জহির রায়হানের গাড়িটি উদ্ধার করতে পারলেও জহির রায়হান বা তাঁর ড্রাইভার বা অন্য কোন সঙ্গীসাথী বা তাদের লাশ কিছুই তারা উদ্ধার করতে পারেনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হচ্ছে, পরাজিত ও পলাতক আল বদর বা রাজাকারদের হাতে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সংগঠিত হওয়ার দেড় মাস পর এত বড় অপারেশন চালাবার মত অস্ত্র থাকা কি আদৌ সম্ভব ছিল? যেখানে তাদের নিজেদের জীবনই বিপন্ন সেখানে তাদের পক্ষে এত বড় সুসংগঠিত অপারেশন চালানো কি করে সম্ভব? এটি যে সম্ভব নয় মুক্তিযোদ্ধা নূরুল কাদির যথার্থই সে সন্দেহ পোষণ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কে বা কারা জহির রায়হানকে নির্মমভাবে হত্যা করলো এবং কেন?

এ প্রসঙ্গে আরেক মুক্তিযোদ্ধা '৭৫-এর আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কর্নেল শরীফুল হক ডালিম তাঁর *'যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি'* গ্রন্থে কোলকাতায় জহির রায়হান কি দেখেছিলেন তার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

'আওয়ামী লীগাররা তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক স্ট্রীটের হোটেল বার এবং রেস্তোঁরাগুলোতে তাদের বেহিসাব খরচের জন্য জয় বাংলার শেঠ বলে পরিচিত। যেখানে তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্লাট বা হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্রান্ড, ম্যাগস, ট্রিংকার্স, ব্লু ফক্স, মলিন রুৎ, হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেস্টুরেন্টগুলো জয় বাংলার শেঠদের ভিড়ে জমে উঠে। দামী পানীয় খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আমেজে রঙিন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয় বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশী হয়। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্রান্ডের বারে মদ্য পান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কবজা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় চার কোটি টাকা।

একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যানরা কাচুমাচু হয়ে জবাব দেয়, সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙালি শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসাল খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সব হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন, 'কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগ পর্যন্ত তিনি ও তার সঙ্গীদের ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবে বারে।' তার হুকুম শুনে বারম্যানরা ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন, 'রোজ আপনার বারে সেল কত টাকা?' ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, পুরো দিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন। পুরো টাকার মদ খেয়ে তারা শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন।

www.pathagar.com

আর একদিন আরেক জয় বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমবারের মত জুতা পরার দিনটি উদযাপন করার জন্য ব্লু ফক্স রেস্টুরেন্টে ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এ ছাড়া অনেক শেঠরা দিল্লী ও বোম্বেতে গিয়ে বাড়িঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কীর্তিকলাপের ওপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামান্য চিত্র তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার ওপর। অনেকেই তার ঔদ্ধত্যে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে।'

আজ প্রশ্ন উঠেছে, বিগত ৩৬ বছরের প্রতিটি সরকারই মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বেনিফিসিয়ারি। কিন্তু কেউ এ হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনে সক্রিয় হলো না কেন? যারা মুক্তিযুদ্ধের রক্তের সাথে এভাবে বেঈমানী করেছে তাদের কি এখন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত নয়? নাকি আবারও তাদের ক্ষমতায় পাঠানো হবে মুক্তিযুদ্ধের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশের সম্পদ লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য?

কর্নেল ডালিম বা জনাব নূরুল কাদিরের মত আমরাও জানি না, জহির রায়হানের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? তবে এটুকু জানি, বছর ঘুরে প্রতিবারই আমাদের সামনে আসে নির্মম একাত্তর। প্রতিবারই একাত্তর আমাদের ঘরের কড়া নেড়ে ডেকে ডেকে বলে যায়, উঠো, জাগো, মিথ্যার অন্ধকার থেকে জাতিকে নিয়ে এসো সত্যের আলোয়। স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি বলে যারা তারস্বরে চিৎকার করে তাদের সবাই স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি নয়।

তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক মিরজাফর, লুকিয়ে আছে জহির রায়হানের মত অনেক মুক্তিযোদ্ধার খুনি। এই খুনি কারা তাদের সনাক্ত করা খুব কঠিন কিছু নয়। যারা স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি বলে দাবী করে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করে কিন্তু ক্ষমতায় থেকে জহির রায়হানের মত মুক্তিযোদ্ধার খুনিদের খুঁজে বের করে না; জহির রায়হানের খুনীরা লুকিয়ে আছে তাদেরই মধ্যে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন বুকের রক্ত ঢেলে লড়াই করেছে স্বাধীনতার জন্য; তারা তখন কোলকাতার হোটেলে বসে ফূর্তি করেছে আর ছক এঁকেছে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে আর তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড় ও নষ্ট রাজনীতি। নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা জাগো, খুঁজে বের করো এইসব অসৎ, দুর্নীতিবাজ ও খুনীদের। সময় এখন সত্য আবিষ্কারের; সময় এখন বুদ্ধিজীবী হত্যার আসল নায়কদের খুঁজে বের করার। অপরাধী সে যেই হোক শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

www.pathagar.com

প্রথম আলোর ক্ষমা প্রার্থনা ও কিছু কথা

এ দেশের মুসলমানরা যেমন সহিংসতা পছন্দ করে না তেমনি কখনোই আল্লাহ, রাসূল, ঈমান, ইসলাম নিয়ে বিদ্রুপ করাকেও বরদাশত করেনি। দেশবাসীর অজানা নয়, কুখ্যাত দাউদ হায়দার মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করলে এমনকি পুরনো ঢাকার শুড়িখানা থেকেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছিল এবং প্রতিবাদের প্রচণ্ডতা দেখে এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রর্বতক খোদ আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান নিজেই দাউদ হায়দারকে দেশ থেকে বহিস্কার করে জনতার রোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন।

সে সময় দেশে কোন ইসলামী রাজনৈতিক দল ছিল না যে, তারা জনগণের মধ্যে এই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। জনতার এ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা ছিল বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় স্বতঃস্ফুর্ত ও অবারিত। ফলে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা চলে, এই প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য কোন রাজনৈতিক শক্তির মদদ পাওয়া না পাওয়ার ওপর দেশবাসী তখনো নির্ভর করেনি, এখনো করে না। দাউদ হায়দার ও তার ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীরা সেদিন মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করে দেখতে চেয়েছিল, রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা দেয়ার পর জনগণ কি আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে, নাকি এ দেশের জনগণের অন্তরে এখনো ঈমানের স্ফুলিঙ্গ ফল্গুধারার মতই প্রবাহমান।

তাদের সেদিনের অভিজ্ঞতা যে মোটেই সুখকর হয়নি বিগত তেত্রিশ বছর ধরে দাউদ হায়দার বিদেশের মাটিতে অবস্থান করা থেকেই তা আমরা অনুমান করতে পারি। এরপর এ দেশের মুসলমানদের ঈমানের তেজ পরীক্ষা করতে এসেছিল তসলিমা নাসরিন। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানের উত্তাপ টের পেয়ে সেই যে সে দেশ ছেড়েছে আজো এ দেশের মাটি তাকে গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়নি। এটি ধর্মোন্মাদনার বিষয় নয় বরং এতে আপন ধর্মের প্রতি মানুষের সহজাত শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই ফুটে উঠেছে।

কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার বিষয়টি কোন রাষ্ট্র বা সমাজই অনুমোদন করে না। যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের কর্মের নিরিখেই নির্নীত হবে তারা

www.pathagar.com

কতটুকু অপরাধী। কোন অপরাধই যাতে সমাজে বিস্তৃত হতে না পারে সে জন্যই আছে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা। এটা অপরাধীর প্রতি কোন জুলুম নয় বরং এটাই সভ্যতাকে সচল রাখার যথার্থ উপায়। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে এটাই স্বাভাবিক। কেউ অপরাধ করলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে এটাও স্বাভাবিক। জনগণ সরকারের কাছে আইনের এ প্রয়োগটুকুই চায়, এর বেশি কিছু নয়।

সম্প্রতি (১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭) প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আলপিন'-এ রাসূল (সা.)কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা হলে দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা দেখে এটিকে অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা করে এ জন্য দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় 'আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী' শিরোনামে সম্পাদক মতিউর রহমানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

আমরা যদি মনে করতে পারতাম তাদের এ দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা আন্তরিক এবং এ জন্য তারা সত্যি অনুতপ্ত তাহলে সবার মতো আমরাও খুশী হতাম। কিন্তু প্রথম আলোই আমাদেরকে এ ব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধায় ফেলে দিল। ওই দিনই (২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭) প্রথম আলো (২য় পৃষ্ঠায়) তার নিজস্ব প্রতিবেদকের বরাত দিয়ে 'আলপিনে কার্টুন প্রকাশ নিয়ে উদ্ভুত ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্বেগ প্রকাশ' শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাপে। তাতে বলা হয় 'সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক সংগঠন ফ্রান্সের 'রিপোর্টার্স উইদাউট বোর্ডার্স' অবিলম্বে প্রথম আলোর প্রদায়ক কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানের মুক্তি দাবী করেছে।'

স্মর্তব্য, সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ঘটনার পরপরই কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানকে গ্রেফতার করে এবং আলপিনের উক্ত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে যাতে করে অনাকাঙ্খাকিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়। প্রথম আলো নিজেই যেখানে ওই কার্টুনিস্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে এবং তার আর কোন কার্টুন তারা ছাপবে না বলে জানিয়ে জনগণের কাছে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সেখানে তার মুক্তির জন্য নিজস্ব প্রতিবেদককে দিয়ে তার মুক্তির দাবী তোলা কতটুকু যৌক্তিক? বিদেশী সংস্থার বরাত দিয়ে এই দাবী তুলে তারা যে জনগণের সেন্টিমেন্টের প্রতিই অশ্রদ্ধা পোষণ করেছে তাই নয়, আইনের প্রতিও যে তারা শ্রদ্ধাশীল নয় তাই কি প্রমাণ করে না? তাহলে জনগণের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার জন্য কেন ক্ষমা প্রার্থনার নাটক করা?

বিষয়টি এখানেই থেমে গেলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু ওই প্রতিবেদক আরো একটু অগ্রসর হয়ে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং মৌলবাদ

www.pathagar.com

ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলনে'র যৌথ বিবৃতির বরাত দিয়ে আরো বলা হয়, *'এই কার্টুনে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কিছু বলা হয়নি।'*

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তাই হবে তাহলে তারা ক্ষমা চাইলেন কিসের জন্য? নিজস্ব প্রতিবেদকে দিয়ে এই বক্তব্য প্রকাশ করে তারা কি এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন, তারা যা করেছেন, ঠিক করেছেন? এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন কবীর চৌধুরী, হেনা দাস, কলিম শরাফী, বিচারপতি কে এম হাসান, অ্যাডভোকেট গাজীউল হক, হাসান আজিজুল হক ও অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তারা বলেছেন, *'এটি একটি প্রচলিত কৌতুক।'*

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোথায় প্রচলিত? এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে, নাকি তাদের মগজে? জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত নয় তাতো জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ধরণ দেখেই বুঝা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সাত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধি আর দেশের চৌদ্দকোটি জনগণের বুদ্ধির মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, সরকার কোন্ পক্ষ অবলম্বন করে?

প্রথম আলোর উক্ত কার্টুনটি প্রকাশের পর দেশব্যাপী যে উত্তাল গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সরকার যথাসময় আমাদের বিজ্ঞ আলেম সমাজকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে সামাল দেন। এ সময় আলেম সমাজের ভূমিকা ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিজ্ঞজনোচিত। আলেম সমাজের পক্ষে বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে দুটো প্রস্তাব দেন তার একটি ছিল প্রথম আলো কর্তৃপক্ষকে এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং অন্যটি ছিল প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল করে এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে।

প্রথম দাবীটি প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ দৃশ্যত পূরণ করলেও দ্বিতীয় দাবীটি এখানো অপূর্ণই রয়ে গেছে। সরকার এখনো প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল করেনি এবং কার্টুনিস্ট ছাড়া যারা এ কার্টুনটি ছেপে কোটি কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে এখনো পর্যন্ত তাদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি। জানি না সরকার এ ব্যাপারে কি ভাবছেন? তবে যদি ভেবে থাকেন ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে গেছে তাহলে তা কতটুকু সঙ্গত হবে বিবেচনার দাবী রাখে।

পর্যবেক্ষক মহলের ধারনা, প্রথম আলোর উক্ত কার্টুন প্রকাশ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বিশ্বব্যাপী মুসলমানদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে এটি তারই ধারাবাহিতকা মাত্র। মুসলমানদের উদ্বেজিত

www.pathagar.com

করার জন্য কিছুদিন পূর্বে ডেনমার্কেও এ রকম কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছিল এবং তাতে বিশ্বব্যাপী উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়েছিল।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, এ দেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে জিকির তোলা হচ্ছে তার প্রেক্ষাপট রচনার জন্যই প্রথম আলো উক্ত কার্টুনটি ছেপেছিল। তাদের ধারনা ছিল, এতে মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে রাজপথে নামবে এবং দেশে জরুরী অবস্থার মধ্যে মিটিং মিছিল করার অপরাধে সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকারকে দিয়ে সহজেই এ দেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করানো যাবে।

বাস্তবে তাই ঘটতে যাচ্ছিল। বায়তুল মোকাররম থেকে মুসল্লিরা মিছিল নিয়ে রাজপথে নামলে পুলিশ তাতে লাঠিপেটা করে এবং প্রায় অর্ধশত মুসল্লি তাতে আহত হয়। এরই রেশ ধরে পরিস্থিতি খারাপের দিকে গড়াতে শুরু করলে উদ্বিগ্ন আলেম সমাজকে নিয়ে সরকার বৈঠক করে এবং আলেম সমাজের পক্ষে বায়তুল মোকাররমের খতিব অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত প্রস্তাবনা পেশ করেন সরকারের কাছে। জনগণ ধরেই নিয়েছিল, সরকার আলেম সমাজের ছোট্ট এ দাবীটি পূরণ করে প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল ও এ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদের আইনের হাতে সোপর্দ করবেন। কিন্তু তা যে হয়নি আমাদের মত জনগণও তা জানে। দেশের বিবেকবান ও শান্তিপ্রিয় মানুষ কামনা করে, বর্তমান সরকার জনগণের সেন্টিমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অনতিবিলম্বে প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল ও এ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদের আইনের হাতে সোপর্দ করবেন।

আমাদের বিশ্বাস, জনগণের মত সরকারও চাইবে না কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিক। যেখানে জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং আমাদের সংবিধানও কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানাকে অপরাধ গন্য করে এবং প্রথম আলো নিজেও যেখানে দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের কৃত অপরাধ, সেখানে এসব অপরাধীদের আইনের হাতে তুলে দিতে বাঁধা কোথায়? অন্যের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়াটা কেবল দুর্নীতি নয়, মহাদুর্নীতি। তাহলে এসব দুর্নীতিবাজদের আইনের হাতে তুলে দিতে সরকারের আপত্তি বা অপারগতা কেন?

২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ প্রথম আলোর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তাদের নিজস্ব প্রতিবেদক আইন ও সালিশ কেন্দ্র আসকের বরাত দিয়ে আরো একটি মারাত্মক আপত্তিকর সংবাদ পরিবেশন করেছে। তাতে বলা হয়েছে, *'জরুরী অবস্থা চলাকালে সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ থাকলেও কোনো কোনো সংগঠনের বিক্ষোভ সমাবেশ, লিফলেট বিতরণের প্রতি সরকার কেন নমনীয় তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। অন্যদিকে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কার্টুন প্রকাশের ঘটনাকে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্টের চক্রান্ত*

www.pathagar.com

হিসাবে অভিহিত করাতেও আমরা বিস্মিত।'

তাদের এ বিস্ময়ের কারণ বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তারা চাচ্ছিল এ ঘটনায় ব্যাপক জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ ঘটবে এবং পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আর বিশ্বকে তারা দেখাবে, দেখো, বাংলাদেশ কেমন জঙ্গী রাষ্ট্র। তাদের এ আশা পূরণ না হওয়ায় তারা মর্মাহত ও বিস্মিত। সরকার কেন আলেমদের সহায়তায় এবং নমনীয় আচরণের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ নিল তা তাদের বোধগম্য না হলেও জনগণ কিন্তু তাতে স্বস্তি পেয়েছে।

আসকের এ বিবৃতিটি যথেষ্ট উস্কানিমূলকও। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে উস্কে দেয়ার এ প্রচেষ্টা দুঃখজনক। প্রথম আলো রাসূলকে নিয়ে কেবল ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর জনতার ওপর পুলিশকে উস্কে দেয়ার কাজটিও তারা করলো এ বিবৃতি-প্রকাশের মাধ্যমে। এসব বিবৃতি যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেনি তাও আমরা বুঝতে পারি রিপোর্টটি থেকেই। প্রথম আলো সাধারণ প্রেসবিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে এসব সংবাদ সরবরাহ করতে পারেনি বরং একজন নিজস্ব প্রতিবেদককে এসাইনমেন্ট দিয়েই তাদের এসব বক্তব্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে হয়েছে।

প্রথম আলোর এসব তৎপরতাই প্রমাণ করে তাদের দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা মোটেই অনুতপ্ত হৃদয়ের নয় বরং নিজেদের গা বাঁচানোর কুটকৌশলমাত্র। অনুতপ্ত হলে কার্টুনিস্টের মুক্তির দাবী বা *'এই কার্টুনে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কিছু বলা হয়নি'* জাতীয় বক্তব্য বা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পুলিশকে উস্কে দেয়ার মত সংবাদ তারা ছাপতো না।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে বিচার্য বিষয় তা হচ্ছে, যদি ধরে নেই প্রথম আলো যথার্থই ক্ষমা চেয়েছে তাহলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল? তাদের এ ক্ষমা কে করবে? তারা কতটুকু ক্ষমার যোগ্য তা নির্ণয় করার জন্যই তো তাদের আদালতে সোপর্দ করতে হবে। আদালত তাদের অপরাধ বিবেচনায় এনে যদি ক্ষমার যোগ্য মনে করেন তাবেই না তারা ক্ষমা পেতে পারেন। বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ তথা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে আইনের হাতে সোপর্দ করার যে দাবী বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের পক্ষে উত্থাপন করেছেন সে দাবী এখনো পূরণ হয়নি।

অপরাধীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই ঘটনার পরপরই তাদের গ্রেফতার করা উচিত ছিল। সরকার এখনো তাদের গ্রেফতার না করায় আমরা দারুণভাবে শঙ্কিত। কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর

www.pathagar.com

রহমান। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন দাউদ হায়দারকে বিদেশে না পাঠালে যে কোন সময় দাউদ হায়দার খুন হয়ে যেতে পারে। যে কোটি কোটি মানুষের অন্তরে দাউদ হায়দার আঘাত হেনেছিল তাদের একজনও যদি তাকে ক্ষমা না করে তবে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যায়। সে যাত্রা দাউদ হায়দারকে বিদেশে পাঠিয়ে তিনি তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

বর্তমান সরকার যদি এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের মত বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন এবং তার ফলে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তার দায় কে নেবেন? আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করি। ক্ষমা চাওয়ার পর প্রথম আলোর ক্ষমা পাওয়া উচিত কি উচিত নয় সে বিতর্কে আমরা জড়াতে চাই না। বিষয়টি আদালতের হাতে ছেড়ে দিলেই সবদিক থেকে মঙ্গলজনক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কাউকে খুন করার পর খুনী যদি প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আদালত কি পারে তাকে ক্ষমা করে দিতে? সে এখতিয়ার কি আদালতের আছে, নাকি তা সঙ্গত হবে?

একজন মানুষকে খুন করা আর কোটি কোটি মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা– কোনটি অধিক গুরুতর অপরাধ আদালতই তা বিচার করবে। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন আইনের পথে চলার জন্য অপরাধীদের গ্রেফতার করা। রাজপথ উত্তপ্ত করার চেয়ে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধশীল হয়ে আদালতের শরনাপন্ন হয়েছে আমি এটাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ মনে করি। সরকার প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল এবং এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত প্রথম আলোর সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্টুনিস্টের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন জেলায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা শুরু হয়েছে। এটি একটি আইনী প্রক্রিয়া। মামলা যে শুধু ঢাকা বা চট্টগ্রামেই থেমে থাকবে এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। ঘটনার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত এ পক্রিয়া চলতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিটি জেলা সদর, মহকুমা সদর এমনকি থানাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এ মামলা করার ধারা।

সবচে যেটি আশঙ্কার বিষয় তা হচ্ছে, এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হওয়া মানুষের সংখ্যা একজন বা দু'জন নয়। এ দেশের চৌদ্দকোটি মুসলমানতো বটেই পৃথিবীর সব দেশের সব মুসলমানের অন্তরই এতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে অপরাধীরা যেমন এ ধরনের অপরাধ করার জন্য আস্কারা পেয়ে যাবে তেমনি কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে দু'একজনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলেও তা দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্টের কারণ হয়ে যেতে পারে। তাতে বিশেষ মহলের বাংলাদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র আখ্যা দেয়ার দুরভিসন্ধি পূরণের পথই পরিষ্কার হবে। অথবা যারা বাংলাদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র বানাবার পায়তারা করছে তারা নিজেরাই

www.pathagar.com

কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তার দায় এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে।

তাই কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে প্রথম আলো ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর ডিক্লারেশন বাতিল করা এবং এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইনের হাতে সোপর্দ করা। বাংলাদেশে দৈনিক পত্রিকার অভাব নেই। কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করার অপরাধে একটি দৈনিকের ডিক্লারেশন বাতিল করলে তাতে দেশ ও জাতির যেমন কোন ক্ষতি হবে না তেমনি স্বাভাবিক তথ্য প্রবাহেও কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

আমরা জানি, সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশকে অস্থিতিশীল করার একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। রাসূলকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা এবং তারও পরে একই ঘরানার সাপ্তাহিক ২০০০-এ কাবা শরীফকে বাইজি পাড়ার সাথে তুলনা করা সেইসব কুচক্রীদেরই কাজ যারা দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য নিরন্তর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করবো সরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এইসব কুচক্রীদের দমনে সক্রিয় হবে এবং দেশের সচেতন মানুষও তাদের সকল তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকবে।

www.pathagar.com

ড. আহমদ শরীফ ও প্রথম আলো গ্রুপের মিশন

প্রথম আলোর ফান ম্যাগাজিন 'আলপিন'-এ রাসূল (সা.)কে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ এবং এ নিয়ে দেশব্যাপী প্রতিবাদের রেশ শেষ না হতেই বাজারে এলো প্রথম আলো গ্রুপের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ২০০০-এর ঈদসংখ্যা। মুসলিম জাতির সর্ববৃহৎ বার্ষিক আনন্দ উৎসব ঈদ। এক মাস সিয়াম সাধনার পর প্রতি বছরই এ দিনটি মুসলমানদের দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে– বলে, আনন্দ করো, আনন্দ। ধনী-গরীব, সাদা-কালোর বিভেদ ভুলে একে অন্যকে বুকে তুলে নাও।

মানুষে মানুষে বিভেদ আর বৈষম্য ঘুচিয়ে এই যে ঈদের আনন্দ সেই আনন্দ ছড়িয়ে থাকবে ঈদসংখ্যার পাতায় পাতায়– মুসলমানমাত্রই তা কামনা করে এবং এটা কামনা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করছি, মহা আড়ম্বরের সাথে যে ঢাউস সাইজের ঈদসংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয় তাতে সম্পাদকীয় ছাড়া আর কোথাও ঈদের নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এবার দৈনিক প্রথম আলো গ্রুপের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ২০০০-এর ঈদসংখ্যায় যেভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও হেনস্তা করা হয়েছে অতীতে এমনটি আর কখনো ঘটেনি।

এই ঈদসংখ্যার অধিকাংশ লেখাই ইসলাম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। ড. আহমদ শরীফের *'ভাব বুদ্বুদ'* দিয়ে এই বিদ্বেষের সূচনা হয়েছে, বিদ্বেষের বিস্তৃতি ঘটেছে দাউদ হায়দারের *'সুতানটি সমাচার'*-এর মাধ্যমে, আর কেন এই বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে সেই বিষয়টি খোলাসা করে বয়ান করেছেন শাহরিয়ার কবির তার *'বাংলাদেশে মৌলবাদ বনাম ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা'* প্রবন্ধে।

পবিত্র রোযার দিনে যখন মুসলমানরা ধর্মীয় আবেগে ভরপুর থাকে তখন ইসলাম ও মুসলমানদের কটাক্ষ করলে তাতে মুসলমানরা যে বিক্ষুব্ধ হবে এটা বুঝার মত বুদ্ধি প্রথম আলো গ্রুপের সম্পাদক ও প্রকাশকদের নেই এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারপরও তারা এ কাজটি কেন করলো, কেন কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে জেনে বুঝে আঘাত হানলো– এ প্রশ্ন সচেতন মহলের মনে জাগতেই পারে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদসংখ্যাটি যে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করার জন্য অত্যন্ত

www.pathagar.com

পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে– পাঠক পত্রিকাটি হাতে নিলেই তা টের পাবেন। ড. আহমদ শরীফের লেখাটি একটি রোজনামচা। যদিও তা ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত নয়। ড. আহমদ শরীফ তার রোজনামচায় কথা শুরু করেছেন এই বলে: 'আস্তিক বা শাস্ত্রবাদী কি কম্যুনিস্ট হতে পারে?'

এর প্রথম পৃষ্ঠায় ড. আহমদ শরীফ ইসলামের অন্যতম ফরজ হজ্জকে কটাক্ষ করে লিখেছেন: *'হজ জান্নাতের Green card পাইয়ে দেয় না।'* যেখানে তিনি ধর্মেই বিশ্বাস করেন না সেখানে জান্নাতের গ্রীনকার্ডের কি দরকার পড়লো তার, বুঝা মুশকিল। তবে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জকে নিয়ে এরূপ বিদ্রুপ আগে কেউ করেছেন বলে মনে পড়ে না। আস্তিক মানুষের জীবন যে বৃথা সে বয়ান তিনি করেছেন ২৯.০৮.৯৩ তারিখের রোজনামচায়। বলেছেন: *'আস্তিক মানুষগুলোর শেষ জীবন বড় অস্বস্তিকর উৎকণ্ঠায় কাটে।'*

তার মতে আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষগুলোর জীবন ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত কয়েদির জীবনমাত্র। মুমীন জীবন মানেই বৃথা জীবন। তিনি বলেন: *'এরা আসলে তখন ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত কয়েদির জীবনই যাপন করতে থাকে কিংবা ক্যান্সার রোগীর নিশ্চিত মৃত্যুর শঙ্কিত প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। বৃথা হয় বেঁচে থাকা।'* আস্তিক কারা তার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন: *'.... অন্যদের শোনা কথায় পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ শাস্ত্রকথায় আস্থার নামই তো আস্তিক্য।'* আস্তিক্যবাদীদের নির্বোধ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন: *'পুতুলকে জীবন্ত ভাবার মতোই এ আস্থা বা বিশ্বাসকে যুক্তিসিদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়। ... মানসিকভাবে সত্যের সন্ধান পেয়েছে বলে এসব নির্বোধরা।'*

আল্লাহতে বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি বলেন: *'আপনি আস্তিকের ঘরে আস্তিকের সমাজে জন্মেছেন তাই আপনি (আস্তিক। অথচ) আপনি তাঁকে চেনেন না, জানেন না, তাঁকে জানে, চেনে, দেখে এমন কারো সাক্ষ্য আপনি পাননি। অতএব, আপনি স্রষ্টা কেন কে কি কেমন কিছুই জানেন না।'* তাহলে আন্দাজ অনুমানে তাঁকে মানবেন কেন? মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি বলেন: *'মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অতীত ও ঐতিহ্যমুখী করছে, আর রাখছে বিজ্ঞান ও সমকালীন চেতনা ও চাহিদা বিমুখ। ..... এর থেকে মুক্তি আবশ্যিক ও জরুরী। নইলে দেশে প্রত্যাশিত গুণের মানের মাপের, সংখ্যার ও মানসিকভাবে বাঞ্ছিত মাত্রার গুণের ও চরিত্রের মানুষ মিলবে না।'* তার মতে: *'কুরআনের কোথাও ধর্মত্যাগীকে হত্যা করতে হবে এমন নির্দেশ দেয়া হয়নি।'*

তিনি ধর্মনিরপেক্ষদের হিন্দু হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে ০৬.০৭.৯৪ তারিখে বলেন: *'গোঁড়া মৌলবাদী বা জামায়াতে ইসলামিরা বাড়াবাড়ি করলে, আমাদের ওপর কথায় কথায় ফতোয়া জারি করলে, ইসলামি নীতি-নিয়ম মানার জন্য হুকুম হুমকি-হামলা বা খবরদারি চালালে আমরা দ্রোহ করব। আমরা আবার হিন্দু হয়ে যাব।'*

www.pathagar.com

তিনি কোরআন কেন চলবে না তার যুক্তি প্রদর্শন করে আরো বলেন: *'একালে স্রষ্টা-সৃষ্টিতত্ত্ব অজ্ঞতাপ্রসূন মাত্র, এটি টিকবে না। ধর্মশাস্ত্র চলবে না ভবিষ্যতে।'*
তিনি পরকালকে অস্বীকার করে বলেছেন: *'শুধু এ মর্ত্যজীবনই সত্য। তাই কেবল এ মর্ত্যজীবনবাদই টিকবে।'* মুনাজাতকারীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন: *'আল্লাহর কাছে 'আবদ' তথা দাস-বান্দা মানুষ ভিক্ষাজীবীমাত্র। ভিখেরী ও ভৃত্য কখনো স্বাধীন-আত্মপ্রত্যয়ী আত্মনির্ভর আত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তি হতেই পারে না। .... যে মুনাজাত করে সে স্বাবলম্বী নয়–ভিক্ষার্থী। তাই মুসলিমদের কোন তরক্কী কখনো হয়নি।'*
বিদায়হজ্জে মহানবী (সা.) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন যতদিন মুসলমানরা কোরআন ও হাদীস আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন মুসলমানদের পতন হবে না। কিন্তু তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: *'কুরআন ও সুন্নাহ-ই যদি সর্বযুগের, সর্বস্থানের সর্বপ্রকার অবস্থার ও অবস্থানের মানুষের সর্বপ্রকার সঙ্কট-সমস্যার, সুখ-আনন্দ-আরামের উৎস ও ভিত্তি হয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মতভেদ হল কেন?'* তিনি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলেছেন: *'বিশ্বসৃষ্টিতে ইশ্বরের কোন স্বাধীনতা ছিল না।... ঈশ্বর হলেন বিশ্বাসী মানুষের বিশ্বাস। আর বিজ্ঞান হচ্ছে অবিশ্বাসের অন্য নাম। আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের মন-মগজ মনন থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসের নির্বাসন।'* কোরবাণী সম্পর্কে তিনি ০৮.০৪.৯৮ তারিখের রোজনামচায় বলেন: *'পশু হত্যা বন্ধ করাই বাঞ্ছনীয়, এ বর্বরতা এ যুগে অমানবিক।'* ২২.০২.৮৯ তারিখের রোজনামচায় তিনি বলেন: *'পাকিস্তানীদের ইসলামি দৌরাত্ম একবার আমাদের বাঙালী ও সেক্যুলার করেছিল। এবার স্বদেশী ও স্বধর্মীর ইসলামি হামলা আমাদের নাস্তিক ও শাস্ত্রদ্রোহী করবে।'*
সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদসংখ্যা ০৭-এ প্রকাশিত ড. আহমদ শরীফের *'ভাব-বুদ্বুদ'* প্রবন্ধে এ রকম ইসলাম বিদ্বেষী আরো অনেক মন্তব্য উদ্বৃত হয়েছে। তিনি যে কেবল ধর্মের ওপর আঘাত হেনেছেন তাই নয়, আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন জাতীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও অশালীন, অমার্জিত, নির্মমসব মন্তব্য করেছেন। নিচে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তার কিছু অসংলগ্ন মন্তব্য তুলে ধরছি।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ২৩.০৮.৯৩ তারিখের রোজনামচায় বলেছেন: *'নজরুল ইসলাম বড় কবি নন... বাণী স্রষ্টাররূপে নিতান্ত সাধারণ। প্রয়োজন ফুরোলে অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তন হলে কবি হিসাবে প্রিয় থাকবেন না।'* ০৫.০৬.৯৮ তারিখের রোজনামচায় বলেছেন: *'তাঁর মধ্যে চিন্তার চেতনার, ভঙ্গির ভাবের কোন ক্রম উৎকর্ষ দেখা যায় না। ১৯১৮ থেকে ১৯৩২ যেমন গুণে মানে মাপে মাত্রায় তাঁর গান-গল্প, কবিতা প্রবন্ধ বৈচিত্র ও বিকাশহীন, তেমনি ১৯৩৩-৩৪ অবধি তাঁর চিন্তা-চেতনা যেন*

www.pathagar.com

পুনরাবৃত্তিমূলক।'

শেখ মুজিবুর রহমান: *'মুজিবুর রহমান স্বয়ং ছিলেন স্বল্পজ্ঞান।.... তিনি ১৯৭১ সনের ২৫ ডিসেম্বর অবধি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে গেছেন। তিনি স্বাধীনতা চাননি।... বাঙালীর স্বভাব হচ্ছে হুজুগে। তাই তারা কাক শিয়ালের মত বুঝে না বুঝে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মেনে নিল।'*

জিয়াউর রহমান: *'জিয়া ছিলেন যুগপৎ ধূর্ত কপট প্রতারক ষড়যন্ত্রকারী। ... এমন অমানুষ সত্যি দুর্লভ।'*

সৈয়দ আলী আহসান: *'অনবরত সুযোগ আবিষ্কার, মিথ্যা নির্মাণ এবং জঘন্যভাবে অর্থ ও লেখা আত্মসাৎপুষ্ট চাটুকারের নামান্তর হচ্ছে সৈয়দ আলী আহসান।'* অন্যত্র বলেছেন: *'অনবরত মিথ্যা নির্মাণের সুযোগ আবিষ্কারের চাটুকারিতায় পদ বাগানোর এবং যথাসময়ে ভোল ও বোল পাল্টানোর অপর নাম সৈয়দ আলী আহসান।'* **শওকত ওসমান:** *'লেখক হিসাবে শওকত ওসমান মাঝারিরও নিচে।'* **আবুল ফজল:** *'আবুল ফজলের রচনা যুক্তি-বুদ্ধি-চেতনার ফসল-তথ্যে বা চিন্তায় ঋদ্ধ নয়।'*এরকম আরো অনেকের সম্বন্ধেই তিনি যখন যা মনে এসেছে তাই লিখেছেন। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারী **আনোয়ার হোসেন** সম্পর্কে তার মূল্যায়ন: *'তাহেরের ভাই মহাউদ্যোগী ও উদ্যমী ডক্টর আনোয়ার হোসেন একাধারে ও যুগপৎ উচ্চাশী ক্ষমতালিপ্সু সুবিধেবাদী ও সুযোগ সন্ধানী আবার গোঁয়ারও।'*

সবার ব্যাপারেই যে তিনি এমন বাজে মন্তব্য করেছেন তা কিন্তু নয়। তিনি জানতেন কাদের চরিত্র হনন করতে হবে আর কাদের তুলে ধরতে হবে মহৎ হিসাবে। তাইতো তিনি **রাজা রামমোহন রায়** সম্পর্কে বলেছেন:

*'রামমোহন রায় মগজে ছিলেন অসাধারণ।... বিদ্যাসাগর চরিত্রে ছিলেন অতুল্য।... মধুসূদন ছিলেন এককথায় আরবী তাজী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দেশ-জাতি-মানুষের কল্যাণ ভাবনায় চিরনিষ্ঠ। আর মেধা-মনীষায় উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।'*তসলিমা নাসরিনের মত তিনিও বাংলাদেশের সীমানা তুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিলনের পক্ষপাতি। ২৫.০৫.৯৩ তারিখের রোজনামচায় তিনি বলেন: *'কোলকাতায় গিয়ে উপলব্ধি করলাম, যারা পূর্ববঙ্গ থেকে গেছে, তারা আজো আত্মায় বিচ্ছেদের স্বজন হারানোর, পিতৃপুরুষের ভিটে ত্যাগের বেদনা ভুলতে পারেনি, তাজা ক্ষত হয়ে তা কর্মে বিরাজ করছে। তাই তাদের মধ্যে মিলনের ও যুক্তবঙ্গের অনুধ্যান প্রবল।'*

একজন মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে বিচিত্র বিষয়-আশয় ধরা দিতেই পারে। তিনি দরকার মনে করলে সেসব অনুভূতি তার একান্ত ডায়রীর পাতায় টুকেও রাখতে পারেন। ড. আহমদ শরীফ এগুলোকে তার সাহিত্যের বিষয় করে চিন্তাশীল

www.pathagar.com

প্রবন্ধ রচনা করেননি। এসব বক্তব্য তিনি জনসমক্ষে প্রকাশও করেননি। তাহলে তার মৃত্যুর পর জাতির এমন কি উপকারের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ তার একান্ত ডায়রীর অমার্জিত মন্তব্যগুলো জাতির সামনে সাড়ম্বরে তুলে ধরার জন্য বেছে নিলেন ঈদ সংখ্যার বিশাল আয়োজন? ইসলাম এবং মুসলমানদের কটাক্ষ করার জন্য কেন বেছে নিলেন রমজানুল মোবারকের পবিত্র সময়কে? পঁচাশি ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশে রমজানের মত ধর্মীয় এবাদতের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মাসে ইসলাম ও মুসলমানদের কটাক্ষ করে ঈদ সংখ্যার মত বিশাল আয়োজনে কিছু লিখলে তাতে যে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হবে এটা বুঝার মত বিচক্ষণতা সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষের ছিল না এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই।

প্রথম আলোতে প্রকাশিত রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকার্টুনটি ভুলবশত ছাপা হয়ে গেছে এমন দাবী প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ করতে পারলেও সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষের এমন দাবী করার কোন সুযোগ নেই। কারণ তারা একজন মৃত ব্যক্তির ডায়রী সংগ্রহ করে তার থেকে ফয়সল আরেফীন দীপন নামে একজনকে দিয়ে সম্পাদনা করিয়ে এ লেখাগুলো বাছাই করেছে। ফলে এখানে লেখকের দায়ভার গ্রহণের সুযোগ নেই; এর দায়-দায়িত্ব পুরোটাই বর্তায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিচক্ষণ সম্পাদক ও সামর্থবান প্রকাশকের ওপর।

ঈদসংখ্যা ২০০০-এর প্রায় সব লেখাই প্রশ্ন সাপেক্ষ। তারা ঘোষণা দিয়েছেন সম্পুর্ণ দেশীয় লেখকদের লেখা দিয়ে তারা এবারের ঈদ সংখ্যা সাজিয়েছেন। হঠাৎ এই স্বদেশী সাজার মর্ম টের পেলাম সূচী উল্টিয়ে। প্রায় আড়াই যুগ আগে মহানবীকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে শেখ মুজিব দাউদ হায়দারকে নির্বাসনে পাঠিয়ে তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। দেশের এই কুসন্তানকে দেশের মাটি আর গ্রহণ করেনি। সুদূর জার্মানি থেকে সেই নির্বাসিত দাউদ হায়দারের লেখা সংগ্রহ করে তাকে পুনর্বাসনের জন্যই যে স্বদেশী সাজার চেষ্টা তা সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। মুসলমান ও ইসলামকে গালি দেয়ার জন্য দীর্ঘ আড়াই যুগ পর দাউদ হায়দারকে খুঁজে বের করার কৃতিত্ব অবশ্যই ২০০০ কর্তৃপক্ষ দাবী করতে পারেন।

এরপর আছেন কাল্পনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বপ্নদ্রষ্টা শাহরিয়ার কবির। বিভেদ ও সংঘাতকে উস্কে দেয়ার কাজে সদা ব্যস্ত এই লেখকের *'বাংলাদেশে মৌলবাদ বনাম ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা'* প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি তার পূর্বাপর চরিত্রই বজায় রেখেছেন। মুসলমানদের প্রধান বাৎসরিক উৎসব ঈদকে কেন্দ্র করে প্রথম আলো গ্রুপের এই উপহাস ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণ কি? কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে, নইলে এতসব লেখা তারা সংগ্রহ করে এই ঈদসংখ্যা সাজাতেন না। ঈদসংখ্যা ২০০০-এর সেই টার্গেট আমরা যা অনুমান করতে পারি তা হচ্ছে:

www.pathagar.com

১. এতে করে মুসলমানরা উত্তেজিত হবে এবং তারা জরুরী অবস্থা অমান্য করে রাজপথ গরম করে তুলবে।
২. রাজপথে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে এবং এই অজুহাতে বর্তমান সরকার দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠবে।
৩. এভাবে বিকাশমান ইসলামী শক্তির অগ্রযাত্রা ব্যহত হবে এবং দেশের মানুষ দুর্নীতিমুক্ত মানুষ খুঁজতে গিয়ে ইসলামপন্থীদের প্রতি যেভাবে ঝুঁকে পড়ছে তাতে একটি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
৪. এসব তৎপরতার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করা সম্ভব হলে সারা দুনিয়ায় প্রচার করা যাবে, এ দেশ একটি মৌলবাদী ও জঙ্গী রাষ্ট্র। ফলে এখানে বিদেশী আগ্রাসন ত্বরান্বিত করা যাবে।
৫. মুজিব ও জিয়ার অনুসারীরা এখনো এ দেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। মুজিব-জিয়াসহ জাতীয় কবি ও জাতীয় ব্যক্তিত্বদের চরিত্র হনন করা হয়েছে যাতে এ দেশ ক্রমে নেতৃত্বশূন্য করা সম্ভব হয় এবং জাতিকে এ নেতৃত্বশূন্য করা গেলেই দেশে বিদেশী হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হবে।
৬. সম্প্রতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার একটি দাবী কোন কোন মহল থেকে তোলা হচ্ছে। প্রথম আলো গ্রুপের এসব তৎপরতা যে এ দাবী উত্থাপনের প্রেক্ষাপট তৈরীর একটি সযত্ন প্রয়াস তা বুঝতে সচেতন দেশবাসীর কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা

আহমদ শরীফ কোলকাতা সফরের সময় উপলব্ধি করেছেন 'যারা পূর্ববঙ্গ থেকে গেছে, তারা আজো আত্মায় বিচ্ছেদের স্বজন হারানোর, পিতৃপুরুষের ভিটে ত্যাগের বেদনা ভুলতে পারেনি, তাজা ক্ষত হয়ে তা কর্মে বিরাজ করছে। তাই তাদের মধ্যে মিলনের ও যুক্তবঙ্গের অনুধ্যান প্রবল।' যদি সে যুক্তবঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের মিশন খানিকটা হলেও পূরণ হয়। এ স্বপ্নের মধ্যে যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনাশের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়ে গেছে তা কাউকে বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার পরও কি করে ২০০০-এর ডিক্লারেশন অব্যাহত থাকে তা ভাবলে বিস্ময় জাগে বৈকি!

এ ধরনের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলকেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না, তাহলে প্রথম আলো গ্রুপের 'প্রথম আলো' ও 'সাপ্তাহিক ২০০০'কে কি করে তাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেয়া যায়? এ দেশের সচেতন জনগণ সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদসংখ্যা বের হওয়ার পর পরই এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানায় এবং সরকার জনগণের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

২০০০-এর উক্ত ঈদসংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে।

আমরা সরকারের সময়োচিত এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। জনগণের পক্ষ থেকে পত্রিকা দুটোর ডিক্লারেশন বাতিল এবং পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার জন্য আইনের হাতে তুলে দেয়ার দাবী জানানো হয়েছে। সরকারের তথ্য উপদেষ্টার কাছে আলেম সমাজের পক্ষ থেকে এ দাবী অত্যন্ত জোরালোভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। এরপর পত্র-পত্রিকায় বিবৃতিসহ নানাভাবে এ দাবী অব্যাহতভাবে সরকারের নজরে আনার পরও আজো পত্রিকা দুটির ডিক্লারেশন বাতিল এবং এর সম্পাদক ও প্রকাশককে গ্রেফতার করে আইনের হাতে তুলে দেয়া হয়নি।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীকে লাঞ্ছিত করার সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছিল এই প্রথম আলো গ্রুপেরই ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টার। এ গ্রুপের উদ্দেশ্য প্রণোদিত রিপোর্ট ও সংবাদগুলো সারাদেশে সংঘাত ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইন্ধন জুগিয়েছিল। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা প্রথম আলোতে মহানবীকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছেপে দেশে সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াস পায়। তাতেও তাদের কাঙ্খিত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ায় তারা সাপ্তাহিক ২০০০-এ ইসলাম ধর্মকে চরমভাবে আঘাত করে রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বর তথা খোদা এবং কাবাকে বাঈজি পাড়ার সাথে তুলনা করে। এভাবে একের পর এক ক্রমাগত তারা এ কোন খেলায় মেতে উঠেছে? কি চায় তারা? কেন তারা যুক্তবাংলার স্বপক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট? কেন জাতীয় নেতৃবৃন্দের চরিত্র হননে তারা মরিয়া? এইসব বিষয়গুলো জাতিকে আজ উপলব্ধি করতে হবে।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে– কালসাপকে দুধ কলা দিয়ে পুষলেও সে কখনো আপন হয় না। সময় সুযোগ পেলে সে ছোবল হানবেই। আমরা দুধকলা দিয়ে দুর্নীতিবাজ পুষেছি এবং সময়মতো তাদের ছোবল খেয়েছি। আমরা দুধকলা দিয়ে তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী পুষেছি, তারা আমাদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে জাতিকে বিভক্ত এবং মানুষে মানুষে হিংসা ও হানাহানি ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে মনুষত্ব ও মানবতাবোধ। এখন আবার আমরা পুষতে শুরু করেছি মিডিয়া কালসাপ। এ সাপ আমাদের ঈমান-আকিদার ওপর ছোবল হানছে, আমাদের জাতিসত্তার ওপর ছোবল হানছে। আমরা আর কতোকাল এ কালসাপের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হবো? আমাদের ধর্ম ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রথম আলো ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর ডিক্লারেশন বাতিল করে এই কালসাপের দংশন থেকে জাতিকে রক্ষা করার কোন উদ্যোগ কি সরকার নেবেন?

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

আত্মসমর্পনের দলিল

(সূত্র: দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা। লেখক: ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর)

বাংলা অনুবাদ

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পনে সম্মতি প্রদান করেছেন। এই আত্মসমর্পনে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাক বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য (আর্মি), সকল আধা সামরিক (মিলিশিয়া বাহিনী ও পুলিশ) এবং অসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক (আলবদর, রাজাকার, আলশামস) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই সকল সৈন্যরা যে যেখানে যেভাবে আছেন সেইভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধীনস্থ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করবেন। এই দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পন চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে এবং যুদ্ধের সব গ্রাহ্য নিয়মাবলী ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই আত্মসমর্পন চুক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

লেঃ জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেন যে, যারা আত্মসমর্পন করবে তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। লেঃ জেনারেল অরোরার অধীনে সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী নাগরিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষর /-
জগজিৎ সিং অরোরা
লেঃ জেনারেল, জি ও সি এবং
পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী ও
বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

স্বাক্ষর/-
আমির আবদুল্লা খান নিয়াজী
লেঃ জেনারেল, সামরিক আইন
প্রশাসক জোন-বি এবং পাকিস্তান
বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের সর্বাধিনায়ক।

এই চুক্তি অনুযায়ী যা সাব্যস্ত হয় তা হচ্ছে:

১. ১৬ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাক বাহিনীর

www.pathagar.com

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য (আর্মি), সকল আধা সামরিক (মিলিশিয়া বাহিনী ও পুলিশ) এবং অসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক (আলবদর, রাজাকার, আলশামস) ভারতীয় বাহিনী সর্বাধিনায়ক জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হয়।

২. লেঃ জেনারেল অরোরা জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আত্মসমর্পনকারীদের প্রতি (আলবদর, রাজাকার, আলশামসসহ পাক আর্মির সকল অস্ত্রধারীকে) যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

৩. এই চুক্তি অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী পাক আর্মি ও তার সহযোগীদের ব্যাপারে জেনেভা চুক্তি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল অরোরা স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিবাহিনীর অধিকার রহিত ও অগ্রাহ্য করা হয়।

৪. জেনারেল অরোরার আদেশে রচিত এ চুক্তিতে 'মুক্তিযুদ্ধ' 'মুক্তিবাহিনী' ও 'বাংলাদেশ সরকার'কে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ৯টি সেক্টরের মাধ্যমে দীর্ঘ নয় মাস যে এখানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। জেনারেল অরোরা যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের স্থলে ভারতের সাথে 'বাংলাদেশ বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক' হিসাবে নিজেকে উল্লেখ করে বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে মূলতঃ বাংলাদেশের বাহিনীর অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে নাকচ করে দিয়েছেন।

এ ধরনের চুক্তি মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে মূলতঃ ভারতের অধীনতাকেই কি বরণ করে নেয়া হয়নি?

নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলীল– যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলীল হিসাবে পরিচিত তাতে বাঙালিকে যে পরিমান অসম্মান ও অপমান করা হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা হয়ে থাকবে। দলীলের কোথাও একাত্তরে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ নেই; মুক্তিবাহিনীর স্বীকৃতি নেই এমনকি বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

কাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল উসমানী এই দলীল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অবাঞ্ছিত ছিলেন, কেন সেক্টর কমান্ডাররা এই অনুষ্ঠানের অপাংতেয় ছিলেন; আওয়ামী লীগ আজো সে প্রশ্নের জবাব দেয়নি। তবে কি সেদিন তারা এ দেশকেও সিকিম, ভুটানের মত তাবেদার রাষ্ট্র বানাবার বরকন্দাজের ভূমিকা পালন করছিলেন?

www.pathagar.com

ভারত-বাংলাদেশ ৭ দফা গোপন অধীনতা চুক্তি

(সূত্র: দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা। লেখক: ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর)

[১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর অক্টোবরে ভারতের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার একটি ৭ দফা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যে ৭ দফা মৈত্রী চুক্তি (অধীনতা চুক্তি নামেই এ দেশে বেশী পরিচিত) সম্পাদন করেছিল তা নিম্নরূপঃ]

চুক্তির শর্তাবলী

১. যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

২. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন থাকবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

৩. বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

৪. অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

৫. সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান; মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

৬. দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব হবে বছর-ওয়ারী এবং যার যা পাওনা সেটা স্টার্লিং -এ পরিশোধ করা হবে।

৭. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ৭ দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের পরপরই তিনি মূর্ছা যান।

www.pathagar.com

ভারত–বাংলাদেশ ২৫ বছর মেয়াদী অধীনতা চুক্তি

(সূত্র: দুই পলাশী দুই মীরজাফর। লেখক: কে এম আমিনুল ইসলাম)

চুক্তির শর্তাবলী

১. উভয় দেশের জনগণ যে উদ্দেশ্যে সম্মিলিত সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ করেছে, সেই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় ঘোষণা করছে যে, তাদের দুটি দেশ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকবে। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অপর পক্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ ও রাষ্ট্রের সম-অধিকারের নীতিমালায় উজ্জীবিত ও পরিচালিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ এবং বৈষম্যকে নিন্দা করে এবং এ সবের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত নির্মূলের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে যাবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের সকল অঞ্চলের জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার প্রতি এবং তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে।

৩. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় জোট নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করছে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং জাতীয় স্বাবভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিই হচ্ছে গুরুত্বপূণ উপাদান।

৪. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল পর্যায়ে বৈঠক ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৫. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সার্বিক সহযোগিতা জোরদার ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখাবে। এই দুটি দেশ সম-অধিকার, পারস্পারিক কল্যাণ ও সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির নীতির ভিত্তিতে নিজের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহনও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

৬. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং পানি, বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচের উন্নয়ন ও বিকাশে যৌথ সমীক্ষা চালাতে এবং যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণেও সম্মত হয়েছে।

৭. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় আর্ট, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে।

৮. দুদেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিস্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক বন্ধনে যোগদান কিংবা অংশগ্রহণ করবে না।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের আগ্রাসন

www.pathagar.com

থেকে বিরত থাকবে এবং অপরপক্ষ সামরিক দিক দিয়ে ক্ষতি কিংবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে পারে এমন যে কোন ধরনের কার্যের জন্য নিজস্ব ভূখন্ড ব্যবহার করর অনুমতি দিবে না।

৯. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের সামরিক সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কোন তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রদান থেকে নিবৃত্ত থাকবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীর দুই পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষ যদি কখনও আক্রান্ত হয় তবে অথবা আক্রমনের হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সেই হুমকি নির্মূলের উদ্দেশ্য যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অবিলম্বে পারস্পরিক সলাপরামর্শে মিলিত হবে এবং এইভাবে তাদের দুই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

১০. চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সাথে এমন কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে না– যা এই চুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ।

১১. এই চুক্তি পঁচিশ বছর মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তা নবায়নযোগ্য। স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে এই চুক্তি অবিলম্বে কাযকর হবে।

১২. এই চুক্তি কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে তা পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার চেতনায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

উনিশশ বাহাত্তর সালের উনিশে মার্চ সম্পাদিত।

ইন্দিরা গান্ধী	**শেখ মুজিবুর রহমান**
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর পক্ষে

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী কারাগার থেকে দেশে ফিরে এসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ৭ দফা মৈত্রী চুক্তির কথা জানতে পেরে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি যেসব ভারতীয় কর্মকর্তা প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন তাদের ফেরত পাঠান। দু'দেশের সীমান্তের যে তিন মাইল খুলে দেয়া হয়ছিল তা বন্ধ করে দেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে জানান: *'ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কারণে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তান সৈন্য মুক্ত হয় মাত্র। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী– যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন।'* তিনি ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ যে চুক্তি করেন সেটাতেও ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতা থাকলেও পূর্ববর্তী চুক্তির মত দাসখত গ্রহণের মানসিকতা এখানে পরিহার করতে হয় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের কারণে। এভাবেই ভারতীয় সেবাদাসদের খপ্পড় থেকে দেশকে রক্ষার জন্য শেখ মুজিব সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতিকে ভারতের অনিবার্য গোলামী থেকে রক্ষা করেন। যদিও ভারত চুক্তির প্রতি বরাবর অবজ্ঞা পোষণ করে তার আধিপত্যবাদী থাবা বিস্তারের চেষ্টা সব সময়ই অব্যাহত রেখেছে।

www.pathagar.com

এ সময়ের সবচে আলোচিত বিষয়
মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধ ও রাষ্ট্রদ্রোহ প্রসঙ্গ।
এ নিয়ে অনেক মিথ্যাচার হয়েছে। বিভ্রান্ত করা হয়েছে জাতিকে।
একের দোষ চাপানো হয়েছে অন্যের ঘাড়ে।
দেশকে সাম্রাজ্যবাদের গোলাম বানানোর অপচেষ্টা হয়েছে
নানাভাবে এবং এখনো হচ্ছে।
তারপরও সাম্রাজ্যবাদের দালালদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে নিয়ে
জাতি বরাবর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে;
কখনো সফল হতে দেয়নি বিদেশী সেবাদাসদের কুটিল চক্রান্ত।

আজ আবার যুদ্ধাপরাধের ধুয়া তুলে জাতিকে বিভক্ত করার
হীন চক্রান্তে মেতে উঠেছে চিহ্নিত সেবাদাসরা।
অবশিষ্ট আওয়ামী লীগ ও বাম রাজনীতিবিদদের ব্যর্থ মিশন সফল করার জন্য
নতুন করে জন্ম নিয়েছে সুশীল সমাজ নামের একশ্রেণীর দালাল এবং
তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেবার জন্য কিনে নিয়েছে কতিপয় মিডিয়া।

দেশ আজ গভীর সংকটে। চক্রান্তকারীরা ইতোমধ্যেই দেশ থেকে
গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিতে সমর্থ হয়েছে। অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হয়েছে।
কেউ যেন সাম্রাজ্যবাদের অবাধ লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করতে না পারে সে জন্য
ডেকে আনা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ– কোটি কোটি মানুষকে বিনা শরে হত্যা করার
সাম্রাজ্যবাদী সেই আদি পুরনো কৌশল।

আমাদের বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বিশেষ করে
গ্যাস কয়লা সম্পদ বন্দর বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দেশকে
রাজনীতি ও নেতৃত্বশূন্য করার সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে।
সিরাজদৌলাকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল
তেমনি আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে
তাদের ঠুকানো হয়েছে জেলে।

জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলে
এই বিদেশী সেবাদাসদের চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।
এ নিয়েই প্রকাশিত হল তথ্যসমৃদ্ধ ও মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ

মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রদ্রোহী

প্রীতি প্রকাশন.ঢাকা